Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমতা। সমতার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর লড়াই-এর মূল্যবান গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গেলে বা সমতার দাবির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। যে মুহূর্তেই, সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম ও মজুরীর সমতা অর্জিত হবে— সেই মুহূর্তেই মানবতার কাছে আনুষ্ঠানিক সমতার প্রশ্ন থেকে প্রকৃত সমতার স্তরে উত্তরণের গতিময়তার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে। —লেনিন

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
শ্রমজীবী মানুষের সচেতন ঐক্য... ১
দেশে বিদেশে ২
চীনের দুর্নীতিতন্ত্র ৩
উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বাম আন্দোলনের রূপরেখা ৪
লোকসানের মুখে পিঁয়াজ চাষী ৫
গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লড়াই ৬
বগটুই গণহত্যা বিচ্ছিন্ন অঘটন নয় ৭
আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নেই ৮

68th Year 48th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 2nd & 9th April 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

গ্রামাঞ্চলে খুনখারাপি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত দখলের প্রকল্প

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্বৃত্তসুলভ কাজকর্ম এবং দুর্নীতির ঘড়া পূর্ণ হয়ে যেন শেষ হয় না। জমি লুঠ, কয়লা খাদান, নদীর বুকের মাটি ও বালি লুঠ, চাষের জমিতে ভেড়ি তৈরি, সরকারী খাস জমি দখল, পুকুর ভরাট, শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি এসবের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা অধিকাংশই জড়িত। এদিকে পুলিশ ও প্রশাসন দলদাসে পরিণত। খুন খারাপি লুঠতরাজ ধর্ষণ কিডন্যাপিং নিত্যদিনের ঘটনা। অধিকাংশ রাজ্যবাসী সন্ত্রস্ত। চোখের সামনে খুন হয়েছে দেখলেও ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না কেউ। আর সাহস করে কেউ সাক্ষী হলে তাঁকেও খুন হতে হবে। এভাবেই শান্তিকল্যাণ বজায় রেখে কার্যত শ্মশানের শান্তির আবহেই একের পর এক নির্বাচনে বিরোধী শূন্য পৌরসভা, পৌরনিগম, বিধানসভা ইত্যাদির উপর আধিপত্য স্থাপন করছে আগাগোড়া দুষ্কৃতিপ্রধান দল তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্যে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই। চাষির শস্যের বাজারদর নেই। স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার পাট চুকে গেছে। বলাইবাহুল্য বিশাল ঋণের গর্ভে ডুবে আছে রাজ্য সরকার। এরই মধ্যে একটির পর একটি ভোট আসছে। পৌর নির্বাচনের পর আসছে আগামী বছরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকতে হলে যা করার তাই শুরু করে দিয়েছে দলটি। কর্মহীন গ্রামীণ যুবকদের কোন না কোন ভাবে খুন জখম বালি-মাটি-কয়লা লুঠের কারবারে জড়িয়ে রেখে, তাদের ব্যবহার করা হবে আবার বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত দখলে।

পাশাপাশি প্রতিটি খুনখারাপি আর লুঠতরাজের ঘটনার তদন্তে সিবিআই জড়িয়ে থাকায় নতুন করে সিবিআইকে বিজেপির মুখ হিসাবে উপস্থাপিত করে শুরু হয়েছে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের বাইনারির পুনর্নির্ম্মাণ। এটাই দুর্বৃত্ততন্ত্রের পঞ্চায়েত দখলের ব্লুপ্রিন্ট।

দুর্বৃত্ত দমন আইনের সংশোধন গণতন্ত্র হত্যার হিংস্র প্রকাশ

সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভা অভিযুক্ত অপরাধী দোষী সাব্যস্ত না হলেও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রমাণ দিতে বাধ্য হবেন, এই ধরনের একটি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (আইডেন্টিফিকেশন) আইন পাশ করল। যত সারা দেশজুড়ে দুর্বৃত্তায়ন বাড়ছে, দুর্বৃত্তায়ন দৈনিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ছে—ততই এই ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী আইনের কড়াকড়ি বাড়ছে। অপরাধী প্রমাণিত হোন আর না হোন, যে কোন ব্যক্তি কোন আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হলেই প্রশাসন তার বায়মেট্রিক তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য দিতে তাঁকে বাধ্য করতে পারে।

ঔপনিবেশিক আমলে মূলত রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একাংশকে বর্বর হিংস্র জনজাতি বলে চিহ্নিত করা হত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই আইন প্রত্যাহৃত হলেও কোন কোন রাজ্যে প্রশাসন এদের জন্মগত অপরাধী বলে চিহ্নিত করার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এঁদের সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হত। প্রয়োজনে এখনও সেই ধরনের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশাসন।

অথচ সংবিধানে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে জোর জবরদস্তি করে তাঁর থেকে সাক্ষ্য আদায় করা যায় না। এখন থেকে কোন ব্যক্তি নিরপরাধ প্রমাণিত না হলেও এই সংশোধিত আইনে তাঁর আঙুলের ও হাতের তালুর ছাপ, পায়ের ছাপ, অক্ষিগোলকের ও কণীনিকার ডিজিটাল চিত্র সমস্ত কিছুই পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনে সংগ্রহ করবে। কোন সামান্য তথাকথিত অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হলেও, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁর অপরাধী চরিত্রকে আরও গভীর মাত্রা দেবে। অর্থাৎ জন্মগত অপরাধী সত্তার মাপকাঠিতে যেমন এখনও অনেক জনজাতির শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্করা শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়, কথায় কথায় গ্রেপ্তার হয়, সেই ব্যবস্থাটি আরও বড় পরিসরে যেকোনো প্রতিবাদী ব্যক্তির ওপরেও চেপে বসবে।

শ্রমজীবী মানুষের সচেতন ঐক্যের ওপর নির্ভর করেই আগামী দিনের বাঁচার লড়াইকে প্রসারিত করতে হবে

সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল সফল হয়েছে বলে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। প্রায় ২০-২১ কোটি শ্রমিক কর্মচারী এই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রসমূহে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সর্বব্যাপ্ত হতে পারে নি। সংগঠিত ক্ষেত্রে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবেই কম। অতি কম। নতুন করে কোনো স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ বন্ধ।

২৮-২৯ মার্চ '২২ -এর ধর্মঘট/হরতাল সম্পর্কিত সংবাদ এদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে তেমন প্রচার না পেলেও আন্তর্জাতিকস্তরে বহু নামী সংবাদপত্র ফলাও করে শ্রমিক শ্রেণির লড়াই-এর সংবাদ বিশদে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদ মাধ্যমগুলিকে অবশ্যই মোদি সরকারের ভ্রূকুটির কাছে অবনত হবার কোনো দরকার পড়ে না। তারা সরকারের দয়ার দানের দিকেও তাকিয়ে থাকে না।

আমরা অতিসংক্ষেপে এই দেশব্যাপী আন্দোলনের দাবিগুলি নিয়ে কিছু উল্লেখ করতে চাই। একথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, দেশের সাধারণ মানুষের জীবন চরম সমস্যার মধ্যে পতিত। মোদি সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশি বিদেশি পুঁজিমালিকদের অঢেল সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। সাধারণের জীবনের চরম সর্বনাশ হয়ে চললেও সরকারের কোনো বিকার নেই। পেট্রোল ডিজেল-এর দাম আকাশচুম্বী। প্রত্যেকদিন ভীতিজনকভাবে বেড়েই চলেছে জ্বালানি তেলের দাম। বিশ্ব বাজারে এই সময়ে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের দাম তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেলেও ভারতের বাজারে তা বিদ্যুৎগতিতে বেড়েই চলেছে। রান্নার গ্যাসেরও একই অবস্থা। একটি সিলিন্ডারের দাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বুঝে ওঠাই সম্ভব নয়। নরেন্দ্র মোদি সমস্ত প্রসঙ্গে ইচ্ছেসুখে কথা বলেন। কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। একটিবারের জন্যও কোনো মন্তব্য পর্যন্ত নেই। সরকার পেট্রোপণ্যের ওপর যে হারে ট্যাক্স বসিয়ে লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন করে তা বন্ধ হলেই কিন্তু জ্বালানি তেল বা রান্নার গ্যাসের দাম অর্ধেক হয়ে যায়। এব্যাপারে রাজ্য সরকারেরও ভূমিকা রয়েছে।

পাঁচটি রাজ্য বিধানসভায় ভোটপর্ব মিটতেই শুরু হয়েছে এই দৌরাত্ম্যমূলক মূল্যবৃদ্ধি। দেশের অর্থমন্ত্রী বৃথাই বলে চলেছেন ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য দাম বাড়ছে। চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বলছন তিনি পলকহীনভাবে। কোভিড অতিমারি পরবর্তীকালে দেশের অর্থনীতি চরম বিপদের মধ্যে থাকলেও মোদি সরকার ন্যূনতম দায়িত্ববোধেরও পরিচয় দিচ্ছে না।

দুনিয়া জুড়ে অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত নয়াউদারবাদের অবাধ প্রসার। প্রায় সব রাষ্ট্রের সরকারই কোনো 'পরিবর্ত'র অভাবে মেনে নিয়েছে এই ব্যবস্থা। অনেকে অবশ্য স্বেচ্ছায় পুঁজিতন্ত্রের প্রতি গভীর আনুগত্যে নিজের নিজের দেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। সেসব দেশের সাধারণ মানুষ বা নাগরিকদের জীবন শাসকদের কাছে কোনো অর্থই বহন করে না। ক্ষমতার অধিকারীই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। জনগণের কি হলো না হলো তা নিয়ে মাথা ঘামালে তো তাদের যারা নিয়োগ করে তারা রুষ্ট হবে। যে কোনো সময় ক্ষমতা থেকে বিদায় করবে। এই ঝুঁকি সেইসব রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিতেই পারে না।

সকলেই জানেন যে, এই নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা মুখ্যত পুঁজি ও শ্রমের চলমান দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে। মুক্ত বাজারের নামে রাষ্ট্রের বজ্রমুষ্টি পুঁজির অকুণ্ঠ সেবায় শ্রমকারি মানুষদের কণ্ঠরোধ করে। এখন তো আগ্রাসী পুঁজির কাল চলছে। ভারতের বর্তমান সরকার অবশ্য একে 'স্বাধীনতা পরবর্তী অমৃতকাল' বলে আখ্যায়িত করেছে। আসলে 'অমৃতকাল' হলো দেশের বিপুল সম্পত্তির মালিকদের আরও অবাধ লুণ্ঠনের কাল। তারা নিরুপদ্রবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর তাদের সংকটের বোঝা অনায়াসে চাপিয়ে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে চলেছে। কয়েক কোটি দরিদ্র মানুষের জীবনযন্ত্রণা উপলব্ধির কোনো দায় এদের নেই। দেশ বিদেশের সমস্ত পুঁজি মালিকদেরই এই অপচেষ্টা করে যেতে সহায়তা দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি। যেমন ভারতের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সম্পূর্ণ চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে এই সরকার পুঁজির পক্ষ নিয়ে শ্রমকে দমন করার কুকর্মে উদগ্রভাবে লিপ্ত।

শ্রমআইনগুলির পরিবর্তে

ভারতে প্রচলিত শ্রম আইনগুলির খোলনলচে পালটে মাত্র চারটি শ্রমকোডের প্রচলন অবশ্যই সরকার পুঁজি মালিকদের স্বার্থপূরণের এক উদগ্র আয়োজন। কেন্দ্রীয় কোনো শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে কোনো আলাপ আলোচনা ছাড়াই একতরফা ভাবে এমন কুৎসিত সিদ্ধান্ত। অবশ্য শাসকদের একান্ত অনুগত শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের নির্বাচিত বা পছন্দমতো নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেই এমন সিদ্ধান্ত কিনা, তা জানা নেই। আর, বর্তমান শ্রমমন্ত্রী তো দীর্ঘকাল রাজস্থান রাজ্যে আর এস এস-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আর এস এস-এর অন্য একটি সংস্থা বি এম এস-এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির দৃঢ় প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। মোদি সরকার এমন অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রমকারি মানুষদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পর্যন্ত ধ্বংস করার অপচেষ্টা করছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উদ্যোগ

কোনকালে, সেই ১৯৫০-এর দশকে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের অর্থে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থাগুলি গড়ে তুলতে থাকে। অনেকেই মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর ও নির্মম শাসনকালে ভারতে বেসরকারি পুঁজির তেমন ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। দেশের মূল শিল্প পরিকাঠামোও প্রয়োজনমাফিক ছিল না। মুখ্যত একটি পিছিয়ে থাকা কৃষি অর্থনীতির দেশ

এর পর ৮ পাতায়

অশ্বমেধ যজ্ঞ

সদ্য অনুষ্ঠিত চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরবর্তী বৃহত্তর নির্বাচনী যুদ্ধ অর্থাৎ, আগামী সাধারণ নির্বাচনে সারা ভারতে প্রশ্নাতীত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রচারাভিযানে নেমে পড়েছেন। দেশের দিকে দিকে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটতে শুরু করেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকৃত লক্ষ্য যেমন প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, নরেন্দ্র মোদী আগামী নির্বাচনে ভারত জয়কে ঠিক সেই চোখেই দেখছেন। হিন্দু ভারত নির্মাণের ''মহান'' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হয়ত মোদীর রক্তপ্রবাহে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ারই সম্ভাবনা। হিন্দু হৃদয় সম্রাট রূপে মোদীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো প্রায় বাস্তব হতে চলেছে। জাত ধর্মে বহুধা বিভক্ত উত্তরপ্রদেশে ভোটে বিজেপি'র বিপুল জয়ের প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই নরেন্দ্র মোদীর। এই রাজ্যে হিন্দুত্ববাদের জয়রথকে এই নির্বাচনে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়তে হল না।

এই মহাজয়ের পশ্চাতে কতখানি মন্দির নির্মাণের আবেগ, কতখানি মোদীর প্রতি মানুষের বিপুল আস্থা, তার বিশ্লেষণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্যই করছেন। কিন্তু কোভিড বিপর্যয় বা কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক সঙ্কট, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অভিঘাত ইত্যাদি এই নির্বাচনে বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হল না। তাতে ভোটের রাজনীতির বিচার বিশ্লেষণ নতুন ভাবে অবশ্যই করতে হবে। বিপদ বড় ভয়ঙ্কর।

আশ্চর্যজনক ঘটনা, যে রাজ্যটি গত পাঁচ বছরে অত্যাচার, অনাচার, বিশৃঙ্খলায় ভারতব্যাপী 'খ্যাতি' (!) অর্জন করেছে, উন্নাও থেকে হাথরস একের পর এক ভয়ঙ্কর সব কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, বছর ব্যাপী কৃষক আন্দোলনে যে রাজ্য থেকেই প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব এসেছে, সেই রাজ্যে দলিত মানুষদের নির্যাতনের দুঃসংবাদে সারা ভারত শিহরিত হয়েছে। গোরক্ষকদের অত্যাচারে রাজ্যে দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হয়েছেন এ সবের কোনও প্রভাবই এই নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়নি। স্বীকার করতেই হবে, বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন, কৃষক সমাজ নারী সমাজের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশের সমর্থন ছাড়া এমন বিজয় সম্ভব হতে পারত না। প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ্য এই নির্বাচনের ফলাফলে বিরোধীদের ব্যর্থতা ও অনৈক্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বহুক্ষেত্রেই বিরোধীদের অনৈক্য বিজেপি প্রার্থীদের বিনা আয়াসে জিতিয়ে দিয়েছে। পরাক্রমশালী দলটিকে প্রকৃত চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলতে হলে বিরোধীদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

''ঝাঁটার কাঠিগুলিকে শক্তভাবে বাঁধলেই আবর্জনা পরিষ্কার সম্ভব হয়। সেই বাঁধন ছাড়া ঝাঁটার কাঠিগুলিই আবর্জনায় পরিণত হয়।'' এই সত্যটা মাথায় রেখেই বিরোধী দলগুলিকে আগামী নির্বাচনে লড়াইয়ের মতো লড়াইয়ে নামতে হলে আর বিলম্ব না করে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পার্লামেন্টে আস্থা ভোট অর্জনে ব্যর্থ হলেন

ইসলামাবাদ, পাকিস্তানের শাসক দল পাকিস্তান-তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত জোটের অংশীদার মুত্তাহিদা কোয়ামি-মুভমেন্ট পাকিস্তান সমর্থন প্রত্যাহার করায় ইমরান খান পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলেন। প্রধানমন্ত্রী খানের ৩৪২ জন সদস্য বিশিষ্ট Lower House য়ে প্রয়োজন ছিল অন্তত ১৭২ জন সদস্যের সমর্থন। MQM-P দল তাদের ৭ জন সদস্য শাসক জোট থেকে বেরিয়ে আসার পর বিরোধী দলের সাংসদদের সংখ্যা ১৭৫ হওয়ায়, ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদটি ত্যাগ করতেই হবে। শাসক জোটের অপর অংশীদার ৭ জন সাংসদবিশিষ্ট বালুচিস্তান আওয়ামী পার্টি (BAP) বিরোধী পক্ষের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইমরান সরকারের বিরোধিতার পথ নিয়েছে। পদত্যাগ ছাড়া ইমরানের সামনে মনে হয় অন্য কোনও পথই খোলা নেই।

ইমরানের পরাজয়ের পর প্রথমত পার্লামেন্ট বর্তমান সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদ (অগস্ট ২০২৩) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। অগাস্টের (২০২৩) পর ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। দ্বিতীয়ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি—নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট করতে পারে। নতুন প্রধানমন্ত্রী অবশ্য আগামী নির্বাচন পর্যন্তই প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন। তৃতীয়ত নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বিলম্ব না করে নির্বাচনের দিন ঘোষণাও করতে পারেন।

মাঝপথে ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা পাকিস্তানে অবশ্য কোনও অভিনব ঘটনা নয়। প্রবল পরাক্রমশালী পাকিস্তান সেনা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে নির্বাচিত হলেও পাকিস্তানে কোনও সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু ইমরান খান জনতার ভোটে নির্বাচিত সরকার নয়, তাই ইমরানের সম্ভাব্য অপসারণের পর পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিপন্ন এমন কোনও আওয়াজ উঠবে না। ইমরান অবশ্য বলেছেন, শেষ বলটি না খেলা পর্যন্ত তিনি ময়দান ছাড়ছেন না। তবুও এই খেলাটিতে ইমরানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হচ্ছে।

SWIFT -এর বিকল্প ব্যবস্থাগুলি

আমেরিকা আরোপিত ''আর্থিক নিষেধাজ্ঞা'' শব্দবন্ধটির সঙ্গে আমরা অনেকেই কম বেশি পরিচিত। আমেরিকার বিরাগভাজন হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বহু দেশের উপরেই এই নিষেধাজ্ঞার খড়্গ নেমে এসেছে। রাশিয়া বনাম ইউক্রেনের সংঘাতের জেরে রাশিয়াকে 'টাইট' দেওয়ার জন্য পশ্চিমা অনেক দেশই আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তবে যে নিষেধাজ্ঞাটি সর্বশেষে জারি হয়েছে তা হল আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা থেকে রাশিয়ান ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ছেঁটে ফেলার ব্যবস্থা। The Society for World-wide Inter Bank Financial Tele- communication বা SWIFT এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে আর্থিক লেনদেন করা যায়। SWIFT থেকে বহিষ্কারের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়ান সংস্থাগুলি আমদানি বা রপ্তানি সম্পর্কিত লেনদেন ছাড়াও বিদেশের বাজারে বিবিধ আর্থিক প্রক্রিয়ায় যেমন ঋণলাভ বা বিনিয়োগ করতে পারবে না। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট রাশিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারও অকেজো করে দেওয়া হয়েছে।

SWIFT থেকে বহিষ্কারের ফলে রাশিয়ার অর্থনীতি এখন ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে। রুবলের দাম পড়ছে ক্রমাগত। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে বেশ নিদারুণ ভাবেই। ওষুধপত্র থেকে সয়াবিন সর্বত্রই এই সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা বা SWIFT থেকে বহিষ্কার পরস্পরের পরিপূরক। তবে রাশিয়ার কাছে পিপল্‌স ব্যাঙ্ক অব চায়নার নেটওয়ার্ক SWIFT ব্যবস্থার কিছুটা বিকল্প হতে পারে। রাশিয়ার কাছে সেটা এক বিশেষ ভরসার জায়গা। তাছাড়া, ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ার সঙ্কটের পর প্রতিষ্ঠিত System for Transfer & Financial Message কেও রাশিয়া ব্যবহার করতে পারে। আর যেটা পারে তা হল CRIPTO CURRENCY। যে মুদ্রার উপর কোনও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই, যার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বন্ধ করার ক্ষমতা কোনও দেশের সরকারের নেই।

আপতকালে রাশিয়া এই বিকল্প ব্যবস্থাগুলির দ্বারা কাজ চালিয়ে নিতে পারলেও, কতকাল এই ব্যবস্থা চলবে, সেটিই দেখতে হবে।

ফান্দে পইড়্যা বগা কান্দে রে—

ঘটনাটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের গভীর প্রেম ছিল ভারতের প্রতি। ইতিহাস সে কথাই বলে, পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল। নয়া রাশিয়া এখন ভালবাসে চিনকেই। রাশিয়ার প্রযুক্তিবিদদের হঠাৎ চিন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসায় কি বিপদেই না পড়েছিল মাও-জে-দঙের চিন। এই সময় 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' যুগও বহুকাল অতিক্রান্ত। সেই চিনের সীমান্ত শত্রু এখন ভারত। ভারত কিন্তু এখনও নির্ভর করে রাশিয়ার উপরই। অথচ রাশিয়ার বড় শত্রু আমেরিকা। এদিকে আমেরিকা ভারতকে কাছ রাখতেই চায়। ভারতকেও আমেরিকার উপর নির্ভর করতেই হয়। সমস্যা হল রাশিয়ার যে কোনও মিত্র দেশকে আমেরিকা সহ্য করতে পারে না। এ তো বড় জটিল অঙ্ক। রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তাতে এই জটিলতা আরও বাড়ছে। যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষত কূটনীতিতে দেনা পাওনার একটা সম্পর্ক থাকে। ভারতে শিল্পোন্নয়নে (ভিলাই ইস্পাত কারখানা) সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যও কম ছিল না। ইউক্রেন সঙ্কটের মতো এক জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশ নীতি এখন এক প্রবল সংকটের মুখে। ভারত এখন কি করে—সাপের গালে না ব্যাঙের গালে..... । এদিকে আগামী দিনের ভূ-রাজনীতিতে উথাল পাথাল হতে চলেছে। পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক এখন প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। নর্ড স্ট্রীমের মধ্য দিয়ে জার্মানী সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে যে কোনও মুহূর্তে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হতে পারে। নর্ড স্ট্রীম (২) এর গ্যাস লাইন পাতার কাজ শেষ হলেও, জার্মানী আমেরিকার চাপেই এই প্রকল্প মারফৎ গ্যাস সরবরাহের অনুমোদন বাতিল করছে।

এই গ্যাস লাইনের পাইপ রাশিয়ার কাছে ইউরোপের উপর প্রভাব খাটানোর এক বড় অস্ত্র। চলমান সংঘাত যত তীব্র হবে, আগামী দিনগুলিতে শক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থার বড় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনের আবহে ভারতের উপরেও চাপ অবশ্যই পড়বে। বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে রাশিয়াকে এক ঘরে বা কোণঠাসা করার জন্য আমেরিকা যত লাফ ঝাঁপ করুক না কেন, রাশিয়াকে জব্দ করার কাজটা খুব সহজ হবে কী? কোটি ডলারের প্রশ্ন। রাশিয়া এবং চীন এখন পুরানো দিনের সব বিবাদ বিসংবাদ ভুলে গিয়ে জোটবদ্ধ। রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের প্রাক্ মুহূর্তে পুতিন এবং চিন পিং-এর মহাবৈঠকের পর এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনও সীমারেখা নেই যা কিনা সহযোগিতার জন্য নিষিদ্ধ। এই বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে চিন রাশিয়ার এই মৈত্রী ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে যে কোনও সামরিক বা রাজনৈতিক জোট থেকে অনেক বেশি শক্তপোক্ত। বলাবাহুল্য, এই ঘোষণার মধ্যে পশ্চিমের দেশগুলির প্রতি এক প্রচ্ছন্ন হুমকিই রয়েছে।

অর্থাৎ বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে চিন-রাশিয়া কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। ইউরেশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল আধিপত্যের কথা ভুলে পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধে চিনকে সঙ্গে না রেখে রাশিয়ার পক্ষে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। এই সত্য তিক্ত বটিকার মতই ভারতকেও গিলতে হচ্ছে। ভারত সাধারণভাবে হিংসার নিন্দা করে, কূটনৈতিক পথে ইউক্রেন-রাশিয়ার সঙ্কট সমাধানের আবেদন মাত্র করতে পারে। এই ভাবেই ভারত এক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এভাবে চিঁড়ে ভিজবে বলে মনে হয় না। অনেকে বলতেই পারে, ভারতের শ্যাম ও কুল রাখার নীতি বর্জন করে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভোটাভুটিতে নির্দিষ্ট পক্ষ নিতেই হবে। আমেরিকা সহ পশ্চিমী দুনিয়া এই কাজটা করতেই ভারতকে পরামর্শ দিয়েছে। ভারতের বর্তমান ভারসাম্যের নীতি রাশিয়া ছাড়া আর কাউকেই খুশি করতে পারেনি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে চিন রাশিয়ার শক্তিশালী অক্ষ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসের পরিহাস, আগামী দিনগুলিতে মস্কোর বিদেশ নীতি এবং ভারত নীতিও বেজিং-এর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সংঘাতের দিনগুলিতে রাশিয়াকে চিনের হাতের পুতুল হয়েই থাকতে হবে, যদি তাই হয়, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহও না করার অনুরোধ রক্ষা করা রাশিয়ার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে না। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নয়া দিল্লীর কাছে বিষয়টি যথেষ্ট আশংকাজনক। তাছাড়া চিন রাশিয়ার এই অক্ষ শক্তি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে শক্তি সরবরাহের টোপ দিয়ে অবশ্যই দলে টানার চেষ্টা করবে।

এতাবৎকাল রাশিয়া ইউরোপকে যে জ্বালানি সরবরাহ করছিল তা এবার দক্ষিণ এশিয়ার দিকেই আসবে। সম্ভবত সহজতর শর্তে। এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও আর আগের মতই থাকছে না। জ্বালানি শক্তির প্রশ্নে অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরশীলতার জন্য ভারতও রাশিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ইউক্রেন প্রশ্নে যদিও এখন পর্যন্ত ভারত রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেনি, যুদ্ধাস্ত্র এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের প্রশ্নে, নিষেধাজ্ঞার জাল বিস্তৃততর হলে রাশিয়া কত দিন ভারতকে এসব সরবরাহ করতে পারবে বা ভারত রাশিয়া থেকে আমদানি করতে পারবে এখনই বলা যাচ্ছে না।

নতুন পরিস্থিতিতে চিন বা পাকিস্তানের চাপ উপেক্ষা করে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ফলপ্রসূ মৈত্রী সম্পর্কের পরিবর্তনও হতে পারে। ভারতের এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। রাশিয়াকে তোয়াজে রাখতে হলে আমেরিকার বিরাগভাজন হতে হয়, আমেরিকার চাহিদা মাফিক কাজ করলে রাশিয়া সামরিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করলে ভারত বিপদে পড়তে পারে। তাতে অবশ্য পাকিস্তান বা চিনের খুশি হওয়ারই কথা। অনেকেই মনে করতে পারেন দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ভারত আমেরিকার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ুক না কেন! কিন্তু অঙ্কটা অত সহজ নয়। ভারতের হিন্দু হৃদয় সম্রাট ভুলে গিয়েছিলেন বিনা নিমন্ত্রণে বিদেশি রাষ্ট্র নেতার বাড়িতে নৈশ আহারের জন্য উপস্থিত হলে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায় না। বা বিদেশি রাষ্ট্র নেতার সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলে অথবা বিদেশি রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে দোলায় দোল খেতে খেতে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের আলোচনা সারলেই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দলের প্রচারে বিশেষ সুবিধা হতে পারে কিন্তু, কাজের কাজ কিছু হয় না। সুষ্ঠু বিদেশ নীতি গড়ে তোলা যায় না। সে চেষ্টাও মোদি সরকারের নেই।

তাই বলছিলাম, ফান্দে পইড়্যা বগা কান্দে রে.... এই জটিল চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একালের ভয়ংকরভাবে চতুর নেতার কোন পথ নেই, সেটাই এখন দেখতে হবে।

চীনের দুর্নীতিতন্ত্র : উন্নয়নের অভ্যন্তরে পার্টি, লুঠ ও দুর্নীতিচক্র

তুষার চক্রবর্তী

একটা সময় ছিল যখন দেশবিদেশের মার্কসবাদীরা উন্নত পুঁজিবাদী এবং পুঁজিবাদের পথানুসারী রাষ্ট্র যে সব অপরাধ ও দুর্নীতিকে সমাজের স্বাভাবিক ব্যাধি বা মনুষ্য-স্বভাবজাত অনিবার্য ঘটনা বলে ধামাচাপা দেয় সেইসব ঘটনার সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বোঝাবার জন্য, প্রতিতুলনা হিসেবে, বিভিন্ন ছোটোবড় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ তুলে ধরতেন।

সেকালে, সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমনকি যাঁরা কমিউনিজমের মতাদর্শে বিশ্বাসী নন, তাঁরাও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সফরে গেলে, নানারকম দুর্নীতির আপাত অনুপস্থিতি চাক্ষুস দেখে, বিমোহিত হতেন। অপরাধ ও দুর্নীতি এই সব দেশ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে—এমনটা মনে করতেন তাঁদের অনেকেই। এর অসংখ্য উদাহরণ বিভিন্ন লেখাপত্রে ছড়িয়ে আছে। উদাহরণ যোগাড় করতে খুব বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে অকুণ্ঠচিত্তে এই ঘটনা স্বীকার করেছিলেন। আর, হয়ত এই সব উদাহরণ ও সাক্ষ্য চাপা দেবার জন্যেই শেষমেষ কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেচ্ছাকাহিনী প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় করত পুঁজিবাদী শিবির।

কিন্তু বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যতই শেষের দিকে এগোতে লাগল—ততোই এই বাস্তবতা ও বিশ্বাসে শুধু যে ফাটল ধরল তা নয়, নৈতিকতার ব্যাপারটা ''সমাজতান্ত্রিক'' রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেন একেবারে উল্টে গেল। দেখা গেল, ক্রমশ রাষ্ট্র ও পার্টিকেন্দ্রিক জনসম্পত্তি লুঠপাটের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে এই সব দেশ। আমরা জানি, রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলারুশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গেছিল এই তিনটি দেশের মধ্যে গজিয়ে ওঠা ধনকুবেরদের অবাধ দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের দরজা হাট করে খুলতে। যার ফলে এই এলাকায় শুধু দুর্নীতি নয়, সবরকম অপরাধের পাশাপাশি সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহও অনেকখানি বেড়ে গেছে। দেখা দিচ্ছে একের পর এক গণহত্যা ও যুদ্ধ। প্রায় আট বছর ধরে চলতে থাকা ইউক্রেন-রুশ গৃহযুদ্ধ ও বর্তমান খোলাখুলি যুদ্ধ যার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে, এর শিকার হচ্ছে মানবতা ও মানবাধিকার।

আর, সমাজতন্ত্রের পতাকা কাঁধ থেকে না নামিয়েই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজসে আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বিকৃতির আরো এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও ভিয়েতনামের মত দেশ। দেশের সম্পদ লুঠপাট ও দুর্নীতির যোগসাজসে কিভাবে ব্যক্তিবিশেষের পাশাপাশি দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক প্রবৃদ্ধি ঘটানো যায়, উন্নয়নশীল অবস্থা থেকে দেশকে বিশ্বের সবচাইতে সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলা যায়—তার এক অনন্য উদাহরণ চীন স্থাপন করেছে। এবং, এই ব্যবস্থাটির একেবারে কেন্দ্রে বসে আছে দুর্নীতি।

ক্রনি-ক্যাপিটালিজম বা দলবদ্ধ-দুর্বৃত্ত-পুঁজিবাদ নামে যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করছেন। এই দৃষ্টান্ত অন্যত্রও এখন অনুসৃত হচ্ছে। ভারতে আম্বানি, আদানিরা খানিকটা একই কায়দায়, কেন্দ্রে ও রাজ্যে যারা যখন শাসন ক্ষমতায় আছেন তখন তাদের সঙ্গে যোগসাজসে জনসম্পদ লুঠপাট করে নিজেদের সম্পদ যেন রকেটের গতিতে লাগামহীনভাবে বাড়িয়ে চলেছে।

আমরা এখন চিনের পার্টি—উদ্যোগপতি ও দুর্নীতির এই ত্রহস্পর্শ নিয়েই আলোচনা করব। এই অপ্রিয় সত্যকে জানা ও স্বীকার করা না গেলে, একে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। একুশ শতকের সমাজবাদী চিন্তা ও প্রয়োগে তাই এই চ্যালেঞ্জ মার্কসবাদীদের নিতেই হবে। ভারতের দুর্নীতির সমস্যার সঙ্গে যার মিল ও অমিল দুটোই নজরে পড়ার মতো।

দুর্নীতির চক্রব্যূহ

দুর্নীতি যদিও বহুরূপে বিরাজ করে, কিন্তু সবধরনের দুর্নীতি তুল্যমূল্য নয়। কোনো রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণ কি? কি তার ফল? এবং তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এই সব প্রশ্ন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি চর্চা করে এবং তার জন্য অনুসন্ধান চালায়। কাজটা কঠিন হলেও, পুঁজি, বিশেষত, বিদেশি লগ্নির ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান জরুরি। সেই কারণেই বহু সংস্থাকে এই অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। গোপনীয়তা যেহেতু দুর্নীতির প্রধান রক্ষাকবচ, তাই স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকার আইন থাকা বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত।

ভারতে আন্না হাজারের নেতৃত্বে কিরণ বেদী, অরবিন্দ কেজরীওয়ালদের ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ'' নামের আন্দোলন ও তথ্যের অধিকার আন্দোলন যে কারণে IMF, WB এবং ফোর্ড ও রকেফেলার ফাউন্ডেসনের আর্থিক অনুদান সহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছিল। যার ফলে ভারতে বিদেশি লগ্নির আনাগোনা সহজ হয়ে ওঠে। Transparency International এই কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ওপর বার্ষিক নজরদারি চালায়। জনস্বার্থ নয়, বাণিজ্য স্বার্থই এই সব গবেষণার মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে চীন এই সব নজরদারি বা অধিকার না দিয়েও কি ভাবে বিশ্ববাণিজ্য ও বিদেশিলগ্নির পছন্দের জায়গা হয়ে উঠল? চীনে কি দুর্নীতি নেই? আসলে ১৯৪৯ থেকে ১৯৮০র দশক অবধি চীন আর্থিক দুর্নীতিকে সত্যি সত্যিই অনেকখানি আটকে রাখতে পেরেছিল। এবং, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শর্ত ও চুক্তিভঙ্গ করার ঘটনা চীনে খুব কম। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দুর্নীতিকে দেশীয় পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য ও দেশের উদ্যোগপতিদের ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে খুলে রেখেছে। গড়ে তুলেছে এক চৈনিক পুঁজিবাদের সহায়ক এক ''দলবদ্ধ দুর্নীতিতন্ত্র''।

চীনের এই দুর্নীতি-ব্যবস্থাপনা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা বা নিন্দামন্দ হলেও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা তেমন একটা ছিল না। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত মিনজিন পেই-এর একটি গবেষণা গ্রন্থ, সেই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করেছে। এই গবেষণা বিপুল সরকারি নথি, দলিল এবং চীনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট ব্যবহার করেছে এবং পাশাপাশি এই তথ্যের ভিত্তিতে চীনের দুর্নীতির কৌশলগত কাঠামোকেও উন্মোচিত করেছে। যার সঙ্গে আংশিক মিল ও অমিল আমরা ভারতের, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও খুঁজে পেতে পারি সহজেই।

ক্রনি ক্যাপিটালিজম ভারত সহ বিশ্বের প্রায় সব দেশই এখন নজরে পড়ে। এ হলো নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে, আধা নিয়ম ও আধা বেনিয়মের এক ব্যবস্থা বা বোঝাপড়া যার অন্তর্বস্তু। রাজনৈতিক ক্ষমতার সহায়তায় বা যোগসাজসে বিপুল আর্থিক মুনাফা অর্জন করাই যার উদ্দেশ্য। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বোঝাপড়া যত সহজ, গণতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক শাসনে ততটা নয়। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো গভীর রাজনৈতিক সংকট ক্রনি ক্যাপিটালিজমের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। মিনজিন সেই তথ্য ও উপাত্ত বা ডেটা পেশ করে দেখিয়েছেন যে চীনে ১৯৮০র দশকের শেষে, ১৯৮৯ সালে যখন গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন শুরু হল, যার পেছনে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির চাপ—যা চীনকে ভেতর থেকে ভেঙ্গে দিতে চাইছিল, তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি রীতিমত চাপের মুখে পড়ে।

অসন্তুষ্টদের অনেকেই ছিলেন উদ্যোগী যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পার্টি ও দেশের আইনকানুনে অবরুদ্ধ ছিল। শুধু রাজধানী নয়, সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, মোট ১৩৭টি শহরে এই বিক্ষোভ জনআন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৬০ লাখ মানুষ। সেই কারণেই তিয়েন এন মেন স্কোয়ারে শেষে সেনাবাহিনীকে নামাতে হয়েছিল। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রবল ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ও আন্দোলনে যুক্ত প্রায় প্রতিটি চীনের নাগরিককে চিহ্নিত করে ফেলেছিল। অতঃপর, এই কাজের পুরস্কার হিসেবে পার্টির নিচের তলার নেতা ও কর্মীদের ও স্থানীয় উদ্যোগী মানুষ, বিশেষত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বোঝাপড়া ও যোগসাজসের একটা বিশেষ সুযোগ ছিল। এই সুযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবহার করে ব্যবসায়িক কাজের সুযোগ।

চীন ভারতের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থায় বিলগ্নিকরণের পথ নেয়নি। চীন, দেশের সরকারের হাতে থাকা জমি, খনিজ পদার্থ, খাদ্য বাণিজ্য সহ নানা ক্ষেত্রে ও পরিষেবায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করে ব্যবসা করার, নতুন নতুন কোম্পানি তৈরির রাস্তা খুলে দিল। চীনে সম্পত্তির আইন খানিকটা আলগা। সম্পত্তি পণ্যের মতো কেনাবেচার অধিকার ছাড়াও থাকে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যবহার করার অধিকার। এই দ্বিতীয় স্তরের অধিকার উদ্যোগীদের হাতে দেবার সুযোগ দেওয়া হলো। যার জন্য, তিন, চার বা ততোধিক সরকারি দপ্তর বা আধিকারিকের দস্তখত/স্ট্যাম্প অত্যাবশ্যক। আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্তরে পার্টির নেতা ও আধিকারিকদের ছোট ছোট নেটওয়ার্ক তৈরি করে অর্থের বিনিময়ে সরকারি সম্পদ হাত করার একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত সেই সময় থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। চীনে স্থানীয় পুজিবাদী বিকাশের রাস্তা খুলে দিয়ে উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির অভ্যন্তরে দেশব্যাপী বিস্তারিত পার্টি নিয়ন্ত্রিত ক্রনি ক্যাপিটালিজমের বীজ এভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দলবদ্ধ দুর্নীতি ও দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ

ক্রমশ চীনের আঞ্চলিক স্তরে পার্টি আশ্রিত দলবদ্ধ-দুর্নীতি তিন ধরনের ক্ষেত্র দখল করেছে। প্রথম ও সর্ববৃহৎ ক্ষেত্রটি ব্যবসায়িক কারণে সরকারী জমি দখল করার অনুমোদন যোগাড় করার দুর্নীতি। দ্বিতীয়টি, সরকারি আধিকারিকদের নিয়োগ প্রভাবিত করার দুর্নীতি। তৃতীয়টি পেশাদার গুন্ডাদের চক্রের মাধ্যমে, পথের কাঁটা দূর করা বা কাজ হাসিল করা। মিনজিন পেই দেখিয়েছেন যে প্রতিটি কাজের জন্য ৬-৭ জনের যোগসাজসের দরকার হয়, যারা একটি নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে। পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের নেতাদের মাধ্যমেও কাজ হাসিল করা যায়, কিন্তু এই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অত্যন্ত অভিজাত বা এলিট কিছু মানুষ। এতে খরচও পরে বেশি। সর্বোচ্চ নেতারাও কাজটি করান আঞ্চলিক স্তরের দুর্নীতিচক্রের মারফৎ। কিন্তু, একমাত্র কোনো উদ্যোগের অনুমোদনের স্তরেই এইসব দুর্নীতি কাজ করে। বাদবাকি উদ্যোগের সাফল্য ও মুনাফা নির্ধারিত হয় বাজারের নিয়মে। যাকে বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুগ বাজার। চীনের ''সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি''কে উর্বর করে তুলেছে সরকারী সম্পদ কোম্পানির কাজে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেবার এই দুর্নীতির প্রণোদনা।

কিন্তু, চীনে দলের খুব উঁচু পদে নিযুক্ত নেতাদের একতরফা দুর্নীতির গভীরে নিমজ্জিত হওয়া ও অপরিমিত হাসিল করার ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। যা ঘটলে, তাদের ওপর দুর্নীতি দমনের কোপ নেমে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিচার হয়, সাজা হয়। সি জিন পিং এর সাম্প্রতিক দুর্নীতি দমন অভিযান এই প্রক্রিয়াকেই সামনে আনছে। যদিও, এই প্রক্রিয়াটি আগেও সচল ছিল। সচরাচর, এই সব চরম দুর্নীতি ও অপরাধ ধরা পড়তে ৭-৮ বছর লাগে। দুর্নীতির সঙ্গে অন্যান্য অপরাধ, যৌন হেনস্থা, জালিয়াতি, কথার খেলাপ, ইত্যাদি যুক্ত হলে ফাঁসিকাঠেও ঝুলতে হয়। কিন্তু, চীনে দলবদ্ধ দুর্নীতি ও দুর্নীতির বাজার তাতে বন্ধ হয় না। আবার পক্ষান্তরে আর্থিক দুর্নীতি খুব বেশি কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চীনের সরকারি সর্বোচ্চ আমলা ও পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা কেন নিজেরাই সরকারের জমি ও অন্যান্য সম্পদ নিজেরা দখল করেন না? স্বৈরাচারী দেশে তো বটেই, পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক দেশেও, এ ধরনের সুযোগ থাকলে তাই তো সচরাচর ঘটে থাকে। এর অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণ মেনজিন পেইয়ের গবেষণা তথ্য সহযোগে চিহ্নিত করেছে।

নেতাদের ও আমলাদের সরকারি সম্পদ নেবার জন্য দরকারী প্রাথমিক পুঁজির অভাব, নিজস্ব ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, এবং ঝুঁকি নেবার সাহসের অভাব একটি দিক। অন্য দিকটি হলো, চীনের নেতা ও আমলাদের সমাজ নিয়ন্তা হিসেবে প্রাপ্ত সামাজিক মর্যাদা এবং গভীর জাতীয়তাবাদী আবেগ, যা নিছক উদ্যোগপতি হলে ক্ষুণ্ণ হবার ভয় থাকে। এবং, উদ্যোগপতি হতে গেলে নিয়ম অনুসারে পার্টি ছেড়ে দিতে হবে, যা সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। এইসব কারণেই চীনে দুর্নীতি থাকলেও তা উদ্যোগের বা প্রজেক্টের মান খুব বেশি ক্ষুণ্ণ করে না, অন্য দেশে ক্রনি ক্যাপিটালিজম যে দোষে দোষী।

চীনে নগর নির্মাণ, সেতু তৈরি, বুলেট ট্রেন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সব কিছুর সঙ্গেই চৈনিক ক্রনি ক্যাপিটালিজমের উপরোক্ত দুর্নীতি জড়িয়ে আছে, কিন্তু তার জন্যে প্রকল্পগুলি ধ্বসে যায়নি, ক্ষয় ধরেনি পার্টির সামাজিক নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিমের উদারনৈতিক পুঁজিবাদ যাকে অনিবার্য্য ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছিল। এই পার্টি জমানায় ক্ষয় ঘটলেও তা খুব শ্লথ গতিতে ঘটছে।

মনে রাখতে হবে যে চীন এক বৃহৎ ও থাকবন্দি কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে থাকা দেশ হলেও চীনের জনগণ যে কমিউনিস্ট তা নয়। চীনের কমিউনিস্ট

এর পর ৮ পাতায়

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বাম আন্দোলনের রূপরেখা

সৌম্য শাহীন

উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, গোয়া, মণিপুরে বিজেপি'র নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের ধাত্রীভূমি পঞ্জাবে মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেখানে কংগ্রেস ও আকালি দলকে পিছনে ফেলে আম আদমি পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

উত্তরপ্রদেশের এবারের নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে বৈধ ভোটের ৪১.২৯ শতাংশ। শেষবারের তুলনায় এবারের নির্বাচনে বিজেপি ৫৭টা আসন কম পেলেও বৈধ ভোট প্রাপ্তির নিরিখে তাদের ১.৬২ শতাংশ উন্নতি হয়েছে। তাদের জোটসঙ্গী আপনা দল (সোনেলাল) ও নিষাদ পার্টি যথাক্রমে ১.৬২ শতাংশ ভোট (১২টি আসন) এবং ০.৯১ শতাংশ ভোট (৬টি আসন) পেয়েছে।

বাকি ৫৬.১৮ শতাংশ পেয়েছে বিরোধীরা। তার মধ্যে সমাজবাদী পার্টি জোট পেয়েছে ৩৬.১ শতাংশ ভোট, যা ২০১৭ সালের তুলনায় ৮.২৫ শতাংশ বেশি। এর ফলে ৭১টি বেশি আসন জিতেছে তারা। অন্যদিকে বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রাপ্ত ভোট শতকরা ১২.৮৮ শতাংশ, যা শেষবারের তুলনায় ৯.৩৫ শতাংশ কম। মাত্র একটি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে তাঁদের প্রার্থী। জাতীয় কংগ্রেসের ঝুলিতে গেছে মাত্র ২.৩৩ শতাংশ ভোট। তাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৩.৯২ শতাংশ ভোট হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে।

অনেকেই মনে করছেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অতিমারী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা মোদী সরকারকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল। এই নির্বাচনের ফলাফল বিজেপিকে আবার নতুন করে অক্সিজেন দিল। একই সঙ্গে অনেকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দিল্লী ও পঞ্জাবে আপের সাফল্যকে দেখিয়ে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আঞ্চলিক দলগুলোর নেতৃত্বে বিজেপি বিরোধী জোটের পক্ষে সওয়াল করছেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে এইসব বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

''বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ'' খোঁজার মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার বশবর্তী হয়ে ''পপুলার ফ্রন্ট'' তৈরির মোহে কখনো কংগ্রেসের সাথে হাত মেলাচ্ছেন, কখনো বা ভরসা রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেস, শিবসেনা বা আপের ওপরে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার— কেবল ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা দলই যে ফ্যাসিস্ট তা নয়। এটা ঠিক যে, হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিজেপি'র রাজনৈতিক উত্থান। ঠিক যেমন ইহুদি বিদ্বেষী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিটলারের নাৎসি পার্টি প্রভাব বিস্তার করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে।

আর এস এসের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকর এবং হিন্দু মহাসভার নেতা সভারকর হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদী তত্ত্বকে আমদানি করেন ভারতবর্ষের মাটিতে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে শুরু হয় এক প্রতিযোগিতামূলক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের লড়াই, যার পরিণতিতে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল। মুহাম্মদ ইকবাল যে ইসলামিক জাতীয়তাবাদের আদর্শগত জনক, তা রাজনৈতিক পরিণতি পায় জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বে।

সেদিনের দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক শুধু আর এস এস বা মুসলিম লীগই ছিল না। বামপন্থীদের একাংশও মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তা ও তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যাক সে কথা। এর উল্টোদিকে সভারকর এক সমসত্ব হিন্দু রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন যেখানে হিন্দু আত্মপরিচয় ব্যতীত সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এমনকি ভারতবর্ষে যে আশিটিরও বেশি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাঁদের কয়েক হাজার বছরের পুরনো নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, নিজস্ব জীবনচর্যার ধারা রয়েছে, সেই বহুত্ববাদকে ধ্বংস করে এই সমসত্ব হিন্দুত্বের বৃহৎ ছাতার তলায় আনতে মরিয়া ছিলেন তাঁরা। বোঝা কঠিন নয় যে ভালোবাসা থেকে নয়, নিছকই সংখ্যার নিরিখে মুসলমানদের কোণঠাসা করতে আর এস এসের এই আদিবাসী প্রীতি।

স্বাধীন ভারতে নেহরু- বল্লভভাই প্যাটেল- লালবাহাদুর শাস্ত্রী-ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এক ধরনের মিশ্র অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটি সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। তথাকথিত এই ঝোঁকের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর সংবিধানের ভরসায় দেশীয় পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে যে বোম্বে প্ল্যান স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির রূপরেখা তৈরী করেছিল, তার নির্মাতা ছিলেন জে আর ডি টাটা, লালা শ্রীরাম, জি ডি বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রমুখ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দলবল। এরা চেয়েছিল মূল শিল্পসমূহ গড়ে উঠবে রাষ্ট্রের সহায়তায়। আর সেইসব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করবে দেশীয় পুঁজিপতিরা। রেল, যোগাযোগ, পরিবহন, ইস্পাত, বিদ্যুৎসহ মূল শিল্পগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগৃহীত হবে বিদেশি ঋণ, মুদ্রাস্ফীতি ও সংগৃহীত করের মাধ্যমে। আর বিশাল জনসংখ্যার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের দায় সরকার নিলে বাড়বে পুঁজিপতিদের বাজার। এই রাজনীতি অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় তথাকথিত সেকুলার সমাজবোধকে তাই সরাসরি বাধা দেয়নি পুঁজিপতিরা।

এই পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি কিছুটা পিছনের সারিতে চলে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা, কেরালা, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠে, এমনকি নির্বাচনে জিতে তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে সরকারও গঠন করেন।

নব্বইয়ের দশকের নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ক্রমাগত শোষণে অতিষ্ঠ হতাশ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে বিজেপি'র জনসমর্থনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে রামমন্দির আন্দোলন। বিপ্লবী রাজনীতির অনুপস্থিতি, মূলধারার বামপন্থী দলগুলোর বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি মোহের ফলে কার্যত সাধারণ মানুষের কাছে কোনো রাজনৈতিক বিকল্প ছিলও না। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ হিন্দী বলয়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে মন্ডল বনাম কমন্ডলকে ঘিরে। ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদী কায়দায় তৈরি করা হয় কৃত্রিম শত্রু, ভারতবর্ষে সে জায়গায় বসানো হয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের।

২০১৪ সালে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার পরে সভারকর-গোলওয়ালকরের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের যে এজেন্ডা, তার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো একটার পর একটা তারা কার্যত বিনা বাধায় অতিক্রম করে চলেছে। বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাজকর্মে সরকার সরাসরি নাক গলাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইউজিসি থেকে শুরু করে ইডি, সিবিআই, এনআইএর মতো প্রতিষ্ঠান তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলছে। এমনকি বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা পর্যন্ত প্রশ্নচিহ্নের মুখে। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ক ধারা অবলোপ থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ মামলার রায় এবং সর্বোপরি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ২০১৯-একটার পর একটা ক্ষেত্রে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।

অতিমারীর সুযোগ নিয়ে সংসদকে পাশ কাটিয়ে খেটেখাওয়া মানুষের বহু লড়াই করে অর্জিত অধিকারগুলোকে এক এক করে লঘু করা হয়েছে। কৃষি আইন, শ্রম আইন, নয়া শিক্ষানীতি, পরিবেশ বিষয়ক আইন বা অরণ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকার ঘনিষ্ঠ কর্পোরেটদের মুনাফা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। এক বছর ব্যাপী কৃষক আন্দোলনের ফলে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে যখন মোদী সরকার বাধ্য হলো পঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, তখন মনে হয়েছিল যে সম্ভবত শাসকের দম্ভ ধাক্কা খেয়েছে। এই ধারণার পিছনে বিশুদ্ধ আশাবাদ যতটা ছিল, ততটা রাজনৈতিক ভিত্তি সম্ভবত ছিল না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গত বছর অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গাড়ি চাপা দিয়ে চারজনকে হত্যা করার নারকীয় ঘটনা ঘটে যায়। সেই গাড়িতে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির পুত্র আশিস। এমনকি তাঁর বন্দুক থেকে কৃষকদের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, তারও প্রমাণ মেলে।

এই ঘটনার পর ছ'মাসও কাটেনি, লাখিমপুর খেরি জেলার আটটি বিধানসভা আসনের প্রত্যেকটাতে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট, কৃষক আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে বিরাট সাংগঠনিক ভূমিকা ছিল বিভিন্ন বামপন্থী কৃষক সংগঠনের। কিন্তু যেখানে যেখানে তাঁদের গণভিত্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সেখানে এই আন্দোলনের সুফল নির্বাচনের ময়দানে সমানভাবে পাওয়া যায়নি। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর এবং মোরাদাবাদ প্রশাসনিক ডিভিশন, যেখানে অখিল ভারতীয় কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির গণভিত্তি অত্যন্ত মজবুত, সেখানে বিজেপিকে হারানোর জন্য তাঁদের নেতৃত্বের ডাকের সুফল পেয়েছে সমাজবাদী পার্টি।

সাহারানপুরের ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি এবং মোরাদাবাদের ২৭টি আসনের মধ্যে ১৭টিতে জয়যুক্ত হয়েছে এসপি প্রার্থীরা। এছাড়াও কৃষক আন্দোলনের তীব্র রেশ পড়েছিল বিহার লাগোয়া পূর্ব উত্তরপ্রদেশের আজমগড় অঞ্চলে। সেখানে ২০টির মধ্যে ১৭টি আসনেই জয়লাভ করে সমাজবাদী পার্টি। এই বিশ্লেষণ থেকে একটা কথা পরিষ্কার, কোনো সুবিধাবাদী জোট নয়, একমাত্র গণ আন্দোলনের পথেই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুখে দেওয়া সম্ভব। আশা করবো, সেই পথ ধরেই অদূর ভবিষ্যতে কৃষক আন্দোলনের ধাত্রীভূমি উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মূলধারার সংসদীয় রাজনীতির ময়দানে বামপন্থী দলগুলি নিজস্ব পরিসর গঠন করতে সক্ষম হবে।

যাতির বজ্জাতি বন্ধ করতেই হবে

যাতি নরসিংহানন্দ এক অতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী। তথাকথিত সাধুবেশী। এই লোকটি মাত্র কয়েকমাস আগেই উত্তরাখন্ডের দেরাদুনে অতি বর্বর উচ্চারণে অভিযুক্ত হয়েছিল। এক ধরনের হিন্দু 'মহা পঞ্চায়েত' আহ্বান করে সমবেত মানুষদের উত্তেজিত করা হয়। ধর্মীয় জিগীর তুলে ভারতের সর্বত্র সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যার উস্কানি দেওয়া হয়। এই বজ্জাতির প্রধান হোতা যাতি নরসিংহানন্দ। শোনা যায়, দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে নাকি ওর এক আশ্রমের ব্যবসা আছে। ওইসব অঞ্চলে মন্দির বা আশ্রমের ব্যবসার সঙ্গে অনেকেই যুক্ত আছেন। ধর্মের নামে ব্যবসা আমাদের দেশে ইদানিং জমজমাট। এমন ধর্ম ব্যবসা সারা দুনিয়াতেই চলে। তা চলুক। ব্যবসা চলতেই পারে। কিন্তু এই লোকটি সম্ভবত তার ব্যবসায়িক সুবিধা আদায়ে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে।

ধর্ম মহাসভা বা হিন্দু মহা পঞ্চায়েত নাম দিয়ে এই সব আদ্যন্ত সমাজবিরোধীরা সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে বেপরোয়া। এখন সরাসরি মুসলমানদের হত্যার অপচেষ্টা করে চলেছে। মোদি জমানায় এদের সমস্ত অন্যায় প্রশ্রয় পাচ্ছে। ক'দিন আগেই খোদ রাজধানী শহরের বুরারি ময়দানে এমন একটি উস্কানিমূলক বক্তৃতার আয়োজন করে নরসিংহানন্দ।

দিল্লি পুলিশ অমিত শাহ'র নিয়ন্ত্রণে। ইতিপূর্বে দিল্লি দাঙ্গায় পুলিশ দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। উল্টে দাঙ্গায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের চূড়ান্ত হয়রানি করেছে। এখনও সেই অপরাধমূলক অনৈতিকতাই চলছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে পুলিশী ব্যবস্থার সহাযোগিতায় উগ্র হিংসা ও বিদ্বেষমূলক হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচি চলছেই। এদের কোনো ভয় বা আতঙ্ক নেই। পুলিশ প্রশাসনকে নির্মমভাবে অপব্যবহার করে মার্কামারা সমাজবিরোধীদের ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে হয়েই থাকে। এ সত্য সবাই জানেন। একইভাবে দিল্লিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এমন জঘন্য কারবার চলছে।

এসব চরম অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম তেমনভাবে সোচ্চার নয়। কারণ সহজেই অনুমেয়। যাতি নরসিংহানন্দ আবার হিন্দু মহাপঞ্চায়েত-এ মুসলমানদের হত্যার নিদান দিয়েছে। প্রায় ৭০০-৮০০ মানুষের উপস্থিতিতে এত বর্বরোচিত দুঃসাহসিক কাজ করেছে এই লোকটি। দেশের সংবিধানের মৌলিক শর্তগুলিই এই উৎকট আক্রমণে বরবাদ হচ্ছে।

সমাজ মাধ্যমের কয়েকজন সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের চরম হেনস্থা করা হয়। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে পড়েন। নির্যাতিত হন। তাঁদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ছবি ও ভিডিও নষ্ট করে ফেলা হয়। ভারতের সংবিধান বিপন্ন এবং জঙ্গি হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা পদদলিত।

এবারেও দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নক্কারজনক। যাঁরা প্রতিবাদী তাঁদের জীবন নরক করার সুচারু ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছেও। সাংবাদিক এবং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ এক অতি আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। দেশে আইনের শাসন নেই। আইনের শাসন বলবৎ করার যে কোনো উদ্যোগকে নস্যাৎ করা হচ্ছে। সেই অপকর্ম যেমন পশ্চিমবঙ্গের শাসককুল করছে ঠিক একইভাবে দিল্লিতে এমন গর্হিত অন্যায়ের অবাধ সংঘটন চলছে। সাধারণ মানুষের আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগঠিত প্রতিরোধ ব্যতীত এমন অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এমন এক হিংস্র ও বিদ্বেষপূর্ণ পরিস্থিতি নির্মাণ করে তাদের লক্ষ্য পূরণে উদগ্রীব। যাতি নরসিংহানন্দের মতো জীবরা সেই অপকর্মে সহায়ক। এদের বিরুদ্ধে সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠা দেশের স্বার্থে একান্ত জরুরি।

লোকসানের মুখে হুগলী জেলার পেঁয়াজ চাষিরা

বিপুল লোকসানের মুখে হুগলী জেলার পেঁয়াজ চাষিরা। এই জেলার বলাগড় ব্লক পেঁয়াজ চাষে বিখ্যাত। এখানকার সুখসাগর পেঁয়াজ ভিন রাজ্য ও বাংলাদেশেও বিক্রি হয়। অনেক কৃষক ৬ থেকে ৮ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ, এই জেলার শহরের বাজারে 'দেশি' পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। খুচরো বাজারের দরের সঙ্গে কৃষকদের পাওয়া দরের কোনো সামঞ্জস্য নেই। সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার। সাধারণভাবে ফলন কম হলে, কৃষকরা বেশি দাম পান। কিন্তু, চাহিদা-যোগানের সূত্র এক্ষেত্রে কাজ করছে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবার চাষের খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি অধিকাংশ কৃষকের পেঁয়াজের মান ও ফলন কমেছে। পেঁয়াজ গাছ বসানোর পরেই গত ডিসেম্বর মাসের 'জাওয়াদ' ঝড়ে অনেকের ক্ষতি হয়েছিল। সার, কীটনাশক বেশি ব্যবহার করায় চাষের খরচ অনেক বেড়েছে। ফলন যাদের কমেনি, তাঁরাও অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ, খরচ বাড়লেও, দাম গত মরশুমের থেকে কম।

গত মরশুমে কৃষকের পেঁয়াজ চাষে লাভ হয়েছিল। বলাগড় ব্লকের সোমড়ার কৃষক জয়ন্ত বাগ। তিনি অন্যের দেড় বিঘা জমি লিজ নিয়ে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। গত মরশুমে বিঘে প্রতি তাঁর খরচ হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ফলন হয়েছিল, ৪৪ কুইন্টাল। কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম পেয়েছিলেন প্রায় ১৫ টাকা। এবারের মরশুমে পেঁয়াজ গাছ বসাতেই বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, ট্রাক্টর, লেবার বাবদ মোট খরচ হয়, বিঘে প্রতি ১৫ হাজার ৪০০ টাকা। জাওয়াদের পর সার, কীটনাশক বেশি দিতে হয়েছে। সারের কালোবাজারিতে খরচও বেড়েছে। বিঘে প্রতি খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার টাকা। বিঘে প্রতি জমির লিজে খরচ হয়েছে ২ হাজার টাকা। মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির ঋণের সুদ দিতে খরচ আরও প্রায় ৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তাঁর খরচ হয়, প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এবারে তাঁর বিঘে প্রতি ফলন হয়েছে ৩০ কুইন্টালের কম। কেজি প্রতি গড়ে ৬ টাকা ৭৫ পয়সা দরে বিক্রি করে ২০ হাজার টাকা দামও পান নি। একই গ্রামের কার্তিক বাগের গত মরশুমে নিজের এক বিঘে জমিতে পেঁয়াজ চাষে খরচ হয়েছিল ১৭ হাজার টাকার কম। ফলন হয়েছিল প্রায় ৩৩ কুইন্টাল। এবারে ফলন হয়েছে ২৭ কুইন্টাল। গত মরশুমে তাঁর ২০ হাজার টাকারও বেশি লাভ হয়। এই মরশুমে পেঁয়াজ গাছ বসাতেই ২০ হাজার টাকার বেশি খরচ হয়। সবচেয়ে বেশি খরচ বেড়েছে সারে। গতবার যেখানে সারে তাঁর খরচ হয়েছিল ৪৫০০ টাকা, এই মরশুমের প্রথম দফায় সেখানে খরচ হয় ৮৮০০ টাকা। জাওয়াদের পর নতুন করে সার দিতে খরচ আরও বেড়েছে। তিনি ৮ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন। কিছু পেঁয়াজ রেখে দিয়েছেন, ভবিষ্যতে দাম বাড়ার আশায়।

একই ব্লকের ইনছুড়া গ্রামের দিবাকর মালিক গতবছর সুখসাগর পেঁয়াজ বিক্রি করেছিলেন ৩০ টাকা কেজি দরে। বর্তমান মরশুমে দাম পাচ্ছেন, কেজি প্রতি ১০ টাকা। গতবার যে সার বস্তা প্রতি (৫০ কেজিতে এক বস্তা) ১৪০০ টাকা দরে কিনতে হয়েছিল, সেই সার এবারে বস্তা পিছু ২০০০ টাকা দরে কিনেছেন। এই মরশুমে জাওয়াদের জন্য পেঁয়াজের গুণগত মান যেমন কমেছে, তেমনই ফলন হয়েছে গতবারের অর্ধেক।

কোম্পানিগুলি গত এক বছরে সার, কীটনাশকের দাম বাড়িয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে কালোবাজারি। কৃষকদের কোম্পানি নির্ধারিত দামের থেকেও অনেক বেশি দামে সার, কীটনাশক কিনতে হয়। যেমন, এন পি কে ১০ : ২৬ : ২৬ সারের দাম বস্তা পিছু বেড়েছে ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা। এটা কোম্পানির নির্দিষ্ট করা দাম। কিন্তু, কালোবাজারিতে সেই দাম আরও বেড়েছে। প্যাকেটে দাম ১৩৫০ টাকা উল্লেখ থাকলেও, অনেক কৃষককে জাওয়াদের পর ১৯০০-২০০০ টাকা দামে কিনতে হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় বিঘে প্রতি তিন বস্তা লাগলে, শুধুমাত্র এই সারেই বাড়তি খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০০ টাকা। বেশি দামে কিনতে হলেও, কৃষকের প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকে কম। অনেকেই ধারে সার, কীটনাশক কেনেন। প্রতিবাদ করলে, ধারে কিনতে পারবেন না। রসিদ ছাড়াই ব্যবসায়ীরা কৃষকের কাছে সার, কীটনাশক বিক্রি করেন। কৃষি দপ্তরে বিপুল পরিমাণ চাষের উপকরণ আসে। কৃষকদের সেসব দেওয়ার কথা। কিন্তু এইসব উপকরণ খুব কম কৃষকই পান। অভিযোগ, শাসক দলের মদতে এর বেশিরভাগটাই চলে যায় ব্যবসায়ীদের কাছে। বীজ, সার, কীটনাশকের কালোবাজারি এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই কৃষকের নিত্যসঙ্গী। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা ফসল সংরক্ষিত রাখা। অনেক কৃষক খড়ের চালার তলায় বিশেষ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষিত রাখেন। তাতে খরচ আছে। জায়গাও লাগে। আবার যত পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়, তার পুরোটা এই পদ্ধতিতে রেখে দেওয়াও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়ার কাজ সরকার করে না। ছোট, প্রান্তিক কৃষকদের অবশ্য ফসল ধরে রাখার উপায় থাকে না। দ্রুত বিক্রি করে অর্থ পেতে হবে। ধার শোধের তাড়া থাকে। অনেকে পেঁয়াজ বিক্রির টাকা পাট চাষে খরচ করেন। পাট বসানোর সময় চলে এসেছে। হিমঘরের অভাব এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা। সমবায় সমিতির হিমঘর পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে কৃষকদের লোকসান হয় না। অনেক কৃষকই সরাসরি মাঠেই ফড়েদের কাছে পেঁয়াজ বিক্রি করেন। কেউ বা বাজারে আসেন। বাজারে দাম সামান্য বেশি মিললেও, নিয়ে আসার খরচ আছে। সময়ও নষ্ট হয়। মাঠ থেকে ফসল তোলার সময় ফড়ে, মহাজনদের দেখা পাওয়া যায়। সরকারের দেখা মেলে না।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে কৃষকদের থেকে সরাসরি পেঁয়াজ কেনার সরকারি ব্যবস্থা নেই। দেশজোড়া ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে এই দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যে সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে ফড়ে ও আড়তদাররা। কৃষি উপকরণের কালোবাজারি রুখতে, হিমঘর করে ফসল সংরক্ষণে বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের থেকে ফসল কিনতে—কোথাও সরকার বা প্রশাসনের পাত্তা নেই। সরকারকে তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য না করলে, লোকসানই হবে কৃষকদের নিত্যসঙ্গী।

অধ্যাপক আইজাজ আহমেদ প্রয়াত

বিগত মাসের শুরুতে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ অধ্যাপক আইজাজ আহমেদ প্রয়াত হলেন। ১৯৮০'র দশকের অন্তিম লগ্নে সমাজতন্ত্রের পিছু হঠার সময়ে এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী সময়কালে আইজাজ আহমেদ মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সমালোচক— আইজাজ আহমেদ বিশ্বের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলিতে অসামান্য ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষটি তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। উপনিবেশবাদ বিরোধী ঐতিহ্য, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আইজাজ আহমেদ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী যুগে পশ্চিম দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী সমাজের এক বড় অংশ যখন মার্কসবাদ থেকে দূরে সরতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই লগ্নে মার্কসবাদের পতাকাকে তুলে ধরতে বৌদ্ধিক দুনিয়ায় এক অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে আইজাজ আহমেদ সরে দাঁড়াননি। তাঁর উত্তর-মার্কসবাদী, উত্তর-আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক সম্পর্কিত রচনাগুলি এখন মার্কসবাদের আলোকে আলোকিত তত্ত্ব সমূহ আমাদের সমৃদ্ধ করে। বামপন্থী ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছাত্র সমাজ তাঁর রচনাগুলি থেকে শিক্ষালাভ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং নানা চটকদার চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে আইজাজ তাঁর জন্মভূমি ভারতে আসেন এবং তিন দশক কাল সময় ভারতে বসবাসকালে দিল্লীর নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে ফেলো হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনগুলি নিয়ে নিবিড় চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

নব্বুই-এর দশকে নয়া উদার নীতি এবং হিন্দুত্ববাদের উত্থানের শুরু হয়। আইজাজ আহমেদ নয়া উদারনীতিবাদ এবং হিন্দুত্ববাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রকল্পগুলির তীব্র বিরোধিতা এবং বামপন্থীদের লাগাতার সতর্ক করে গেছেন আইজাজ।

আন্তর্জাতিক স্তরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদের চারিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীর পর্যালোচনা বৌদ্ধিক জগতে তাঁর বিশেষ অবদান। ইরাকের যুদ্ধ, ন্যাটো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য আগ্রাসী যুদ্ধগুলির বিশ্লেষণ করে আইজাজ আহমেদ দেখিয়েছেন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বময় একাধিপত্য বিস্তারের পক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পগুলির প্রকৃত চরিত্র।

পশ্চিমের মার্কসবাদী অনেক পণ্ডিতের ধারণা, বর্তমান বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। আইজাজ আহমেদ এমন চিন্তাভাবনার তীব্র বিরোধিতার করে বাস্তব ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে প্রমাণ করেছেন সাম্রাজ্যবাদ তার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় নি। আইজাজ কখনও আরাম কেদারায় আশ্রিত শিক্ষাবিদ ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগও ছিল। ভারতে বসবাসকালে ছাত্রসমাজ এবং গণ আন্দোলনের কর্মীদের বিরামহীনভাবে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। মার্কসবাদের আলোকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এক দুঃসময়ে মার্কসবাদে আজীবন দীক্ষিত আইজাজ আহমেদের মতো এক সংগ্রামী মানুষকে আমরা হারালাম।

মূল্যবৃদ্ধি মানেই অসংগঠিত শিল্পের নাভিশ্বাস

জ্বালানির দাম যেভাবে বেড়েই চলেছে মুদ্রাস্ফীতি শুধু নয়, রাজস্বের ঘাটতিও দ্রুত বেড়েই চলবে। ফলে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম বেশি ধাক্কা খাবে অসংগঠিত ক্ষেত্র। একে তো নোটবন্দি, জিএসটি, লকডাউনের ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি যে আরও কত ক্ষুদ্র/মাঝারি সহ তথাকথিত স্বরোজগার নির্ভর হকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করবে, তা আন্দাজ করা কঠিন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিমারির সময়ে কিভাবে ২৭০০টির মতো একচেটিয়া উৎপাদন সংস্থা অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন এবং কম সংখ্যক কর্মীর সাহায্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোগ্যপণ্যের বাজারে দখলদারি করে ক্ষুদ্র মাঝারি উৎপাদন শিল্পের বাজার ধ্বংস করেছে, তার একটি তথ্যনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরেছে। দীর্ঘ দিন লকডাউন চলায় অসংগঠিত শিল্প অতদিন ধরে পুঁজি রক্ষা করতে পারে নি। তার উপর ছিল জিএসটির চাপ, কম করেও কর্মচারীদের কিছুটা মজুরির রিলিফ দেওয়ার চাপ সহ্য করতে না পেরে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এইভাবে চললে উপরোক্ত কারণগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটলে ভোগ্যপণ্যের বাজারে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত আধিপত্য বিস্তার করে অসংগঠিত ছোট শিল্পকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে।

একচেটিয়া বাণিজ্যসংস্থা শুধু বাড়তি উৎপাদন খরচ মিটিয়ে মুনাফা বৃদ্ধিই করছে না, দক্ষতা বৃদ্ধিকারী প্রযুক্তির পাশাপাশি নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি করছে। ফলে একদিকে যেমন তাদের কর্মচারীদের মুদ্রাস্ফীতি/মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা বাড়ছে, অন্যদিকে অসংগঠিত শিল্পের কর্মীদের মজুরি শুধু কমছেই না। অনেকক্ষেত্রে কাজ হারিয়ে বেকার হচ্ছেন। দেখা গেছে গত পাঁচ বছরে বড় প্রতিষ্ঠানে দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত ২০ শতাংশের আয় ৪০ শতাংশ বেড়েছে। আর দরিদ্রতম ২০ শতাংশের আয় কমেছে ৪৫ শতাংশ।

জনগণকে কিছু পাইয়ে দিয়েই মোদী-মমতা নির্বাচনে বাজিমাত করছে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লড়াইকেই তীব্রতর করতে হবে

সদ্য সমাপ্ত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশসহ চারটি রাজ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। পাঞ্জাবে প্রথমবার রাজ্য সরকার গড়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)। দেশের এক বিপুল অংশ জুড়ে মোদী এখন বসেছেন বিধাতার আসনে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাঁর বক্তৃতায় এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিজেরই বিস্ময় উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া ও মণিপুর—এই চার রাজ্যে বিজেপি'র অভূতপূর্ব জয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন 'জিত কা চৌকা'।

পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা অনুষ্ঠিত হলেও এবার দেশের অধিকাংশ মানুষের কৌতূহল ছিল উত্তরপ্রদেশের ভোট ও সেখানকার ফলাফলের ওপর। যেখানে প্রতি পাঁচ বছরে ক্ষমতাশীল দলের পরিবর্তন ছিল প্রায় অনিবার্য। সেখানেও এবার মোদী-যোগীর জয়ের ধারা রইল অব্যাহত। বিজেপির 'উগ্র' জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় সমালোচক দেশের উদারবাদী মানুষজন আশা করেছিলেন, উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভায় বিজেপিকে হয়তো বিরাট সংখ্যায় নামিয়ে আনা যাবে। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের আইনের শাসনের প্রতি অবিশ্বাস, 'এনকাউন্টারে' খুনের বলি হয়েছে অসংখ্য মানুষ এবং কোভিড বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণে চরম অব্যবস্থা সারা রাজ্য জুড়ে। লখিমপুর খেরি জেলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পুত্র তাঁর এসইউভি গাড়ীর চাকার তলায় পিষে মারলো ঐতিহাসিক কৃষক বিক্ষোভে অংশগ্রহণরত চারজন মানুষকে। এ সব ঘটনার পরও লখিমপুর খেরি জেলার ৮টি আসনের সবক'টি জিতেছেন বিজেপি প্রার্থীরা।

২০২০ সালে দলিত কিশোরীকে নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় গোটা বিশ্বে কুখ্যাত হয়ে যাওয়া হাতরস, উন্নাও-এ কিশোরী নির্যাতনের অভিযোগে সেখানকার বিজেপি বিধায়কের যাবজ্জীবন সাজা...ইত্যাদি একের পর এক জঘন্য সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ এবারের নির্বাচনে বিজেপিকে যথেষ্ট চাপে রাখবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভোটের বাক্সে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়লো না। উত্তরপ্রদেশের বহু নির্বাচনী মিছিলে অখিলেশ যাদব বা কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধী তাঁদের গলা ফাটিয়েছেন যোগী সরকারের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে।

উন্নাও-এ কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধী যে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য নির্যাতিতার মাকে নির্বাচনে প্রার্থী করেছিলেন, ভোটে তার সুফল পাওয়া তো দূরের কথা, বাস্তবে কংগ্রেস সেখানে মুছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতপুষ্ট যোগী সরকারের এতো কিছু অনৈতিকতা ও কুশাসনের পরেও এবং বহু মানুষের প্রত্যাশাকে পরিহাসের স্তরে নামিয়ে এনে বিজেপি ও তার সঙ্গীরা করায়ত্ত করলো ২৭৩টি আসন। উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতাসীন দলের পতন ছিল প্রায় অনিবার্য, কিন্তু এবার সেটি তো হলোই না বরং উত্তরপ্রদেশ রইলো উত্তরপ্রদেশেই।

প্রসঙ্গক্রমে সকলের জানা, গতবছর পশ্চিমবঙ্গ দখলের জন্য মোদী-শাহ'র কি-না সাংঘাতিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল। শেষ পর্যন্ত বিজেপির অধরাই থেকে গেল পশ্চিমবঙ্গ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসন নিয়েই তারা পাড়ি দিলেন অন্যত্র। এই দুই রাজ্যের দুটি নির্বাচনে বেশ কিছু সাদৃশ্যের মধ্যে গতবছর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পরে তৃণমূল ও বিজেপি ছাড়া রাজ্য বিধানসভায় অন্য কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব শূন্যে পরিণত। অবস্থান করলো শুধু ঘাসফুল ও পদ্ম। এবার উত্তরপ্রদেশের অবস্থাও একই। লখনউ-এর আকাশে শুধু দুটি পতাকা, মোদী-যোগীর পদ্ম এবং সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবের 'সাইকেল'। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর বহুজন সমাজপার্টি (বিএসপি) হয়ে গেল ইতিহাস। বিধানসভা ভোটের শুরুতেই ইউ পি নির্বাচনকে '৮০ বনাম ২০ শতাংশের লড়াই' এই বলে মন্তব্য করে ধর্মীয় মেরুকরণের তাস খেলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ফলপ্রকাশের পর ইউপি'র ভোটারদের ভোট দেওয়ার প্রবণতায় লক্ষ করা গিয়েছে বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ, তার মধ্যে মহিলা সম্প্রদায়ের ভোটও কুড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন বিজেপি'র প্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, চলতি নির্বাচনে ইউপি'তে একটি আসনেও বিজেপি মুসলিম প্রার্থী দেয়নি। যেমন, মুজফফরনগর ও শামলি কেন্দ্রে ৪১ শতাংশ ভোটার মুসলিম, তা সত্ত্বেও ঐ দুই কেন্দ্রে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৫১ শতাংশ।

ইউপি'র সামাজিক সমীকরণটা বরাবরই জটিল। কোথাও দলিতদের শক্ত ঘাঁটি আবার কোথাও গভীরে জাঠদের শিকড়। কোথাও ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করার প্রয়াস চালাতে হয়, আবার কোথাও ক্ষত্রিয়দের ভোট টানতে কষতে হয় অন্য পাটিগণিত। এই জটিল সমীকরণটাই জলবৎ তরলং করেছে বিজেপি। তাই ভোটের মুখে একের পর এক দলিত নেতা বেরিয়ে গেলেও পদ্মের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রয়েছে। এবার যতটুকু ভোট অখিলেশ যাদবের 'সাইকেলে'র ঝুড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী ভোট মায়াবতীর ঝুলি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে বিজেপির প্রভাব বলয় থেকে পশ্চিমবঙ্গের মতোই আর কোনো রাজ্য যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতো,

সনৎ ঘোষ

তা হলো পাঞ্জাব। সেখানে বাজিমাৎ করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। কেজরিওয়াল একক শক্তিতে জিতেছেন ১১৭টি আসনের মধ্যে ৯২টি। পাঞ্জাবে ধর্মীয় রাজনীতির ভরকেন্দ্র শিরোমণি আকালি দল, এবার পেয়েছে মাত্র তিনটি আসন এবং ভারতীয় গো-বলয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি জিতেছে মাত্র একটি আসনে।

এই রাজ্যটি ভারতের 'সবুজ বিপ্লব'-এর কাণ্ডারি। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবিনষ্টকারী কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কালা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের আশীর্বাদ জুটিয়েছে আপ। বিজেপির দিকে পাঞ্জাবের মানুষ যে ফিরেও তাকায়নি তার অন্যতম কারণ হলো, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে দলটির সর্বগ্রাসী মনোভাব। শিরোমণি অকালি দলও ও কংগ্রেস সরকার পরিচালনায় বারবার ব্যর্থ হওয়ায় পাঞ্জাবের মানুষ সরকার পরিচালনায় বাছাই করলেন আপ-এর মতো একজন সেই অর্থে অজ্ঞাত কুলশীলকে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের রাজ্য মণিপুরে ২০১৭-এর নির্বাচনে ৬০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় গেরুয়া শিবির পেয়েছিল ২১টি আসন। তখন এন পি পি, এন পি এফ এবং নির্দলের সমর্থনে বিজেপি সরকার গড়েছিল। সে সময় কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা থেকে মাত্র তিনটি আসনে পিছিয়ে ছিল। আর এবার বিজেপি পেয়েছে ৩২টি আসন এবং কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র পাঁচটি আসন। সশস্ত্র জঙ্গিদের ধারাবাহিক গোলাবারুদের ব্যবহার হয়তো বিজেপির পক্ষেই গেছে।

উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী বিজেপি এবং দ্বিতীয় স্থানে সমাজবাদী পার্টির মধ্যে ব্যবধান বিরাট, ২৭৩ বনাম ১২৫। উত্তরাখন্ডে এই ব্যবধান বিজেতা বিজেপির সঙ্গে রানার আপ কংগ্রেসের মধ্যে ৪৭ বনাম ২০। আরবসাগর তীরে গোয়ায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ২০, দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেসের ১২ এবং এন পি পি পেয়েছে মাত্র ৭টি আসন। পাঁচ রাজ্যের ভোটে বিরোধীরা নিজেদের পছন্দমতো ঘুঁটি সাজিয়েছিল। যেমন, ইউপি'তে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আবার গোয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস।

মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি আজ ভারতের সেই অংশের মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান' এই তিনটি শব্দের সঙ্গে তারা এক আত্মিক যোগ অনুভব করে। ওই 'হি-৩' বৃত্তে বিজেপির শিক্ষাগুরু আর এস এস-এর নিরলস প্রয়াস এবং নরেন্দ্র মোদীর পরিচালনায় গড়ে উঠেছে এক নিশ্ছিদ্র দুর্গ। ঐ বৃত্তে মোদী এখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছেন; যার মূল কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যা তিনি যথেচ্ছ অপব্যবহার করলেও তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এখন কারোও নেই। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো মনোবল ও অর্থবল বিরোধীদের নেই। শতাব্দী-প্রাচীন কংগ্রেস দল এখন সাংগঠনিকভাবে খুবই অগোছালো। দাবার বোর্ড এখন সম্পূর্ণ মোদীর নিয়ন্ত্রণে, প্রতিপক্ষের হাতে কোনও বোড়েও নেই।

বিভিন্ন রাজ্যে মোদী ও মমতার (শুধু পশ্চিমবঙ্গ) নির্বাচনী জয়ের নেপথ্যের আর কিছু কথা এবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। নির্বাচনী যুদ্ধের অগোচরে আর এস এস-এর প্রচারকরা জেলায় জেলায় অবিরত কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রের বহুবিধ কল্যাণমূলক যোজনা গ্রামীণ সমাজের আনাচ কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে 'ডবল-ইঞ্জিন' সরকার প্রতিষ্ঠিত। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকার 'ডবল-ইঞ্জিনের' না হলে বা কেন্দ্রের সাথে রাজ্য সরকারের সুসম্পর্কের অভাব থাকলে রাজ্যের ভাঁড়ারে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা খুব কঠিন। আবার রাজ্যভিত্তিক দল থেকে দেশের কর্ণধারকে বেছে নেওয়াও ভোটদাতার মনোজগতে প্রশ্ন তৈরি করে, পাশাপাশি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস দলের প্রতিও মানুষের আস্থার অভাব ঘটছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাওয়ার যে প্রকল্প কেন্দ্র হাতে নিয়েছিল, তার সুফল ভোটবাক্সে পেয়েছে দল। করোনাকালে পরিবারের পুরুষদের আয়-উপার্জন বিধ্বস্ত হলে তেমন কিছু না থাকলেও পরিবার পিছু খাদ্যশস্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও গৃহিনীদের কাছে স্বস্তিদায়ক হয়েছে। সরকারী বেশ কিছু যোজনার সুফল সরাসরি পৌঁছেছে গৃহকর্ত্রীদের কাছে।

পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু সরকারী প্রকল্প বিশেষ করে মা-বোনদের খুব আকৃষ্ট করেছে। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প-২৫ থেকে ৬০ বছরের মহিলারা (সাধারণ) মাসে ৫০০ টাকা এবং তপশীলি জাতি বা তপশীলি উপজাতি হলে মাসে ১০০০ টাকা পায়। কন্যাশ্রী প্রকল্প - পড়াশুনার সাথে যুক্ত বালিকা, যাদের বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত তারা ১২ ক্লাসে উত্তীর্ণ হলে এককালীন ২৫০০০ টাকা পায়। রূপশ্রী প্রকল্প ১৮ বছরের উর্ধে কিশোরীরা বিবাহের সময় এককালীন ২৫০০০ টাকা পায়। সব ক্ষেত্রে পরিবারের বছরে আয় ১,৫০,০০০ টাকার কম হতে হবে। এখন বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত করে সরকার সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে এবং তারই প্রতিফলন পড়ছে ভোটের বাক্সে।

মোদী ও মমতার বিভিন্ন যোজনা বা প্রকল্প এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে মোহিত বা বিভ্রান্ত করেছে কিন্তু এই সাময়িক প্রাপ্তিলাভে মূল সমস্যার সমাধান হবে না—এটি ধৈর্য্যসহকারে বুঝতে হবে এবং জনগণকে বোঝাতে হবে।

মোদী মমতার চমকদারী প্রকল্পকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যে, এগুলো সাময়িক, এতে তার মূল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না। বরং তার মানবিক চেতনার অবনমন ঘটবে, গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ খর্বিত হবে। বদান্যতা নয়, মৌলিক ও ন্যায্য নাগরিক সামাজিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ে অধিকমাত্রায় জনতাকে সামিল করাই হবে এই সময়ের আশু কর্তব্য।

আর এস পি'র নেতৃত্বে রানাঘাট স্টেশনের পূর্বপাড়ে টিকিট কাউন্টারের দাবি

রানাঘাট রেল স্টেশনের পূর্বপাড়ের টিকিট কাউন্টার অবিলম্বে চালু করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের টাইম টেবিল ব্যবস্থা রাখা, যাত্রীদের স্বার্থে চলন্ত সিঁড়ি সব সময় চালু রাখা সহ একগুচ্ছ দাবিতে গত ৫ এপ্রিল মঙ্গলবার রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিল আর এস পি। উল্লেখ্য, মাস দুয়েক আগে রানাঘাট স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘটা করে ওই চলন্ত সিঁড়ির উদ্বোধন হয়। নিত্যযাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, উদ্বোধনের কয়েকদিন পর থেকেই দিনের অধিকাংশ সময় ওই সিঁড়ি বন্ধ থাকে। এতে আপ ও ডাউন প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন প্রবীণ যাত্রীরা। এছাড়া এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছাড়া অন্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে ট্রেনের সময়সূচি বোর্ড না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। আর এস পি রানাঘাট লোকাল কমিটির সম্পাদক সুবীর ভৌমিক বলেন, রানাঘাটের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সুবিধার্থে ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। সর্বদা দুর্ঘটনার ভয় থাকে। তাই যাত্রীদের স্বার্থে আর এস পি'র পক্ষ থেকে দাবীপত্র পেশ করা হয়। এর আগেও রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাবীপত্র পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। রানাঘাট রেলস্টেশনের এক আধিকারিক বলেন, ডেপুটেশনের বিষয়গুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। কর্তৃপক্ষ যদি এধরনের নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে তবে ভবিষ্যতে নিত্যযাত্রী সহ অন্যান্য রানাঘাটবাসীদের নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন কম. সুবীর ভৌমিক।

বগটুই গণহত্যা বিচ্ছিন্ন অঘটন নয়

বিশ্বকবির কর্মস্থল বীরভূম জেলা। তাঁর পিতাঠাকুর নিরিবিলি নির্জন এবং অকর্ষিত বিশাল জমি কিনেছিলেন। সাধনা করবেন, এমনই উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এই বোলপুরেই মানবজীবন চর্চা করে গেছেন দীর্ঘ বহু বছর। শিক্ষা সাধনার উন্মুক্ত অঙ্গন শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতী। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেওয়া বীরভূম জেলা।

এই জেলারই অধুনা মহকুমা শহর রামপুরহাট। আড়ে বহরে দিনে দিনে বেশ বড় শহরে পরিণত। শহরের একপাশ ঘেঁষে রাজ্য সড়ক। মোটামুটি চলনসই অবস্থা। বালি, পাথর, কয়লা বোঝাই ডাম্পারগুলো প্রায় সারা দিন রাত চলেছে এই পথে। সে সবই যে সরকার নির্দিষ্ট আইনকানুন মেনে তা নয়। আবার সরকারিভাবে যেসব নিয়ম জারি করা হয় তার তার ওপরে আছে সরকারের রক্ষক বাহিনী। গ্রামে গ্রামান্তরে এবং শহরেও। এরাই এখন সরকার। থানা পুলিশ মায় প্রশাসনের কর্তারা প্রায় সবাই এদের নির্দেশে দিন কাটায়। এদের প্রচুর উপার্জন। তা না বলে বলা উচিৎ—তোলা আদায়। এক বিষচক্র। এখন রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বাধাবন্ধনহীন। পুলিশ জো হুজুর।

রামপুরহাট পৌঁছনোর সামান্য আগেই তারাপীঠ। স্বয়ং জাগ্রত ঈশ্বরীর থান। অন্ধ বিশ্বাসে মোহগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের নিত্য যাতায়াত। সেখানেও বেশ জমিয়ে ব্যবসা চলে। অন্য ধরনের তোলা আদায়। এসব অঞ্চল একসময় গভীর জঙ্গল। অনেকে বলেন ডাকাতদের নিত্য আনাগোনা। তাদেরই কেউ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কালীমূর্তির পুজো শুরু করেছিল হয়তো। এসব প্রসঙ্গে ঔৎসুক্য দেখানোও পাপ। বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর। কত না গল্প কাহিনী এমন জেগে থাকা ঈশ্বরীর অবস্থান নিয়ে। প্রচুর অর্থ সমাগম। কিলো কিলো সোনার গয়না মূর্তির অঙ্গে। যেখানে এক জড়বস্তুর এমন সম্পত্তির পাহাড় সেখানে তো জ্যান্ত মানুষদের একাংশ ব্যবসায় মত্ত হবেনই। সমস্ত তীর্থস্থানের একই চেহারা। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যারা কারবার করে তাদের চারিত্র বৈশিষ্ট্যও একই। সব ধর্মেই তা সত্য।

গত ২১ মার্চ যে নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হল, তার অকুস্থল বগটুই গ্রাম। বিস্ময়কর যে, রামপুরহাট শহরের একেবারে লাগোয়া একটি গ্রামে বেশ অনেকক্ষণ ধরে নির্মম হত্যাকান্ড, অথচ পুলিশ বাহিনী বা দমকলের দেখা মিলল না সময়মতো। ঘটনাবলীর বিবরণ—২১ মার্চ রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ প্রায় জাতীয় সড়কের কাছেই একটি চায়ের দোকানে চা সহযোগে কথাবার্তা বলে অঞ্চলের তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েতী রাজের অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ভাদু শেখের হত্যা। বোমা ছুঁড়ে। প্রায় তৎক্ষণাৎই মৃত্যু। ভাদু শেখের পরিচয়—তিনি বেশ কিছু বছর আগে পেশায় ভ্যানচালক, মুরগীর মাংস বিক্রেতা অতি সাধারণ এক দরিদ্র গ্রামবাসী। তৃণমূল সংযোগ ২০১১র পর থেকেই। স্থানীয় পুরিশের সঙ্গে দহরম মহরম। পুলিশের গাড়ি চালানোর কাজ। অতঃপর অতি দ্রুত উত্থান। বালি পাথর কয়লা বহনের বেআইনি কারবারে অন্যতম মুখিয়া হয়ে ওঠা। অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক।

বগটুই গ্রামে ঢোকার পথেই, প্রায় জাতীয় সড়কের লাগোয়া এক বিশাল প্রাসাদ। চমকে যাবার মতো। আশেপাশের মানুষজন বললেন, এটা ভাদু শেখের বাড়ি। তিনি উপপ্রধান হবার পরেই এমন পেল্লাই এক প্রাসাদ বানিয়েছেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পঞ্চায়েতী ক্ষমতা অপব্যবহার করে প্রভূত অর্থ উপার্জন হয়েছে। কিন্তু তাই সব নয়। আসল অর্থ সমাগমের বিকার চরিতার্থ হয়েছে বালি, পাথর ও কয়লাবাহী ডাম্পারের ওপর ধার্য অবৈধ করের টাকায়। কেউ বলেন DCR মানে ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট আর কেউ বললেন ওয়েলফেয়ার ট্যাক্স হিসেবে ট্রাক/ডাম্পার পিছু অন্ততপক্ষে পাঁচশ টাকা আদায়। প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা আদায় হয়, তার ভাগ তৃণমূল কংগ্রেসের বড় নেতারা যেমন পান, পুলিশের কর্তারাও পান। এত বিস্তৃত লুণ্ঠনের ব্যবসা যে, একার পক্ষে চালানো সম্ভব নয় তা, সহজবোধ্য। সহজেই বোঝা যায়, ভাদু শেখের হত্যা লুঠের বখরায় গণ্ডগোল। সাধারণত এমন হয়েই থাকে।

ভাদু হত্যার বদলা নিতেই ওর বাড়ি থেকে সোজা পথে এক কিলোমিটারের দূরত্ব বগটুই গ্রামের সাত আটটি বাড়িতে সশস্ত্র হামলা। এই গ্রামের পুরুষরা গণ্ডগোলের আঁচ পেয়েই গ্রামছাড়া। মহিলা ও শিশুদের ওপর আগ্রাসী হামলা। তাঁদের হাত পা বেঁধে একটি বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন লাগানো। পেট্রোল কেরোসিনের অবাধ ব্যবহার। বোমাবর্ষণ চলে মুর্হুমুহু। সারা রাত ধরে বদলার তড়িৎগতি আয়োজন। জ্বলে পুড়ে আর্তরব তোলা অসহায় মানুষদের চিৎকার।

পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়নি সময়মতো। দমকলও পৌঁছেছে অনেক দেরীতে। শোনা যায় যে, ভাদুর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে সাবাড় করতেই স্থানীয় তৃণমূল মাতব্বররা পুলিশকে অকেজো করে গণহত্যা নিশ্চিত করেছে। বোমা বা অন্যান্য মারণঅস্ত্রগুলি জড়ো করা হয়েছিল চোখের নিমিষে। অতি নির্মম এক অঘটন। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও ধোঁয়াশাপূর্ণ।

নির্মম হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এমন খুনোখুনি, আগুন লাগানো আদৌ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তাও নেই। যখন তখন নিশ্চিন্তে মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে। হাওড়া জেলার আমতা থানায় দক্ষিণ সারদা গ্রামে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে আনিস খানের নির্মম হত্যা, পুরুলিয়ার ঝালদায় নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি তপন কান্দুর হত্যা বা পানিহাটিতে তৃণমূলীদেরই নির্বাচিত পৌরসদস্য অনুপম দত্ত'র হত্যা বা বর্ধমানে তুহিনা খাতুনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদির সঙ্গে বগটুই গণহত্যা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এককে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সমগ্র রাজ্যই এখন বধ্যভূমিতে অবনত। কোনো মানুষই আর নিরাপদ নয়। কখন কাকে হত্যা করা হবে তা, বুঝে ওঠা কঠিন। বারুদের স্তূপের ওপর জীবন। যে কোনো সময় বিস্ফোরণ।

বগটুই গণহত্যার পরেই মাথায় অক্সিজেন কমে যাবার সমস্যা বলে কথিত রাজ্যের মহানেত্রীর আদরের কেষ্ট নিদান দিয়েছিলেন টিভি ফেটে আগুন ও এত মৃত্যু। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তথ্য প্রমাণ গোপন করতে। কয়েকজন বলির পাঁঠা অবশ্য চিহ্নিত হয়েছে। তাদের মধ্যে যেমন ভাদু শেখের পৃষ্ঠপোষক তৃণমূলী নেতা রয়েছে তেমনই দু-একজন পুলিশ কর্তাও। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত চলছে। মোদির সঙ্গে নেত্রীর সেটিং হয়ে গেলেই তদন্ত অন্যপথে যাবে। মৃতদের আত্মীয়স্বজনের চোখের জল শুকাতে যা সময়। তারপর আবার ভোট—আবার বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত বা বিধানসভা। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই নিশ্চিন্তে জনসাধারণের সর্বনাশ করে চলেছে।

সমাজবিরোধীদের অবাধ দৌরাত্ম্য

গভীর পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় হলেও পশ্চিমবঙ্গ মার্কামারা সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে অবনত। প্রসঙ্গটি সর্বার্থে নতুন নয়। ২০১১ সালের পর থেকেই এমন যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা রাজ্যের মানুষের। ইদানিং তা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি নির্মিত হয়েছে। যে কোনো মানুষকে যখন তখন হত্যা করা এখন আর কোনো অভিনব বিষয় নয়। একের পর এক খুন, এমনকি গণহত্যা পর্যন্ত হয়ে চলেছে। রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সত্য গোপনে অজস্র মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে সত্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব দিচ্ছে। রাজ্য পুলিশের কর্মকুশলতা এবং রাজনৈতিক চাপ অস্বীকার করে কর্তব্য পালনে অপারগতা তীব্রভাবে স্পষ্ট হচ্ছে। বালি, পাথর, কয়লা, প্রভৃতির অবৈধ ব্যবসায়ে শাসকদলের শীর্ষনেতৃত্বের গভীর সংযুক্তি কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। লর্ড এ্যাকটনের এক ঐতিহাসিক উক্তি—'ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রসার ঘটায়'। পশ্চিমবঙ্গে চরম সত্য বলে প্রতিভাত। সিবিআই কোনো প্রশ্নের উর্ধে নয়। কিন্তু রাজ্য পুলিশের চরম অপদার্থতা ও পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থানে অন্য কোনো পথ আর খোলা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলি হেলনে সিবিআই চলে। একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র বিজেপি বিরোধিতার মধ্যে যদি সত্যতা থাকে তাহলে, বিজেপি নিয়ন্ত্রিত সিবিআই সারদা, রোজভ্যালি বা নারদা প্রভৃতি অতি কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এতদিনেও গুটিয়ে আনতে পারল না কেন?

আসলে মোদির অঙ্গুলিহেলনে যেমন সিবিআই চলে তেমনি, তৃণমূল কংগ্রেসও চলে। আপাতদৃষ্টিতে যে বিরোধের আভাস পাওয়া যায় তার সবটাই গট-আপ। তা নাহলে, এত বিপুল দুর্নীতির প্রমাণ থাকার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস দলের উচ্চতম নেতৃত্ব জেলের ঘানি টানত। এই সরল সত্যটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বোধগম্য করে গ্রহণ করাতে হবে। না হলে এমন প্রবঞ্চনা চলতেই থাকবে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি কমপক্ষে ১.৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে না রাখলে বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য

সম্প্রতি গত ২ এপ্রিল আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংক্রান্ত প্যানেল তাদের ষষ্ঠ সমীক্ষার শেষ বা তৃতীয় অধ্যায়ে ঘোষণা করেছে, বর্তমানে পৃথিবীতে সঞ্চিত গ্রিন হাউস গ্যাস ২০৩০ সালের মধ্যে কম করেও ৪১ শতাংশ কমালেই একমাত্র বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫° সেন্টিগ্রেড সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। বারংবার সাবধান বাণী ঘোষণা সত্ত্বেও উদ্বেগজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গত এক দশকে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ ১২ শতাংশ বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রাক্ শিল্পায়ন যুগের তুলনায় তাপমাত্র ১.১° সেন্টিগ্রেড বেড়ে গেছে। যদিও ১.৫° সেন্টিগ্রেডকে লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয় বা ১.৬° কে বিপজ্জনক মাত্রা বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে তা একটি আপেক্ষিক হিসেব মাত্র। যত কম হয় তত মঙ্গল। আই পি সি সি বিষয়টাকে প্রযুক্তির দৃষ্টিতেই দেখছে। কম খরচে কার্বন ডাই অক্সাইড হ্রাস করার প্রযুক্তি অথবা কার্বন শোষণ করার যন্ত্রপাতি সহ রিনিউয়েবল শক্তি যথা বায়ু এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, গ্যাস, পেট্রোলের ব্যবহার দ্রুত কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে। প্রতি টন কার্বন ডাই অক্সাইডের উৎপাদন কমানোর জন্য নাকি নতুন করে মাত্র ২০ ডলার খরচ করে ব্যাটারি চালিত যান, জীবনধারা বদল করার অভ্যাস ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর দেখা গেছে যত বেশি বিকল্প শক্তির উৎস ব্যবহার করা যাচ্ছে ততই উৎপাদনের খরচ কমছে। সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ৮৫ শতাংশ এবং বায়ু বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ এক দশকে ৫৫ শতাংশ কমেছে যাই হোক সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্বের মূল প্রশ্ন লুকিয়ে আছে কতটা প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব চরিত্র ও পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন করে পৃথিবীর সম্পদ ক্রমাগত ধ্বংস না করে জীবনচর্যার রূপান্তর ঘটাতে পারে মানবসমাজ। মুনাফার জন্য অতি উৎপাদন কমায় ভোগ্যবস্তুর ভোগ করার অনবরত ক্ষুধা জাগানো, দেশে দেশে মারণযুদ্ধ, ধনবৈষম্য এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোনো বাস্তব বিকল্প নেই।

Vol. 68 Issue No. 48 শনিবার ২ এপ্রিল, ৯ এপ্রিল ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

শ্রমজীবী মানুষের সচেতন ঐক্যের ওপর নির্ভর করেই আগামী দিনের বাঁচার লড়াইকে প্রসারিত করতে হবে

১-এর পাতার পর

হিসেবেই ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যায়। তেমন এক অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পুঁজিবাদী বিকাশ সম্ভব করার লক্ষ্যেই জনসাধারণের অর্থ (করের টাকায়) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উদ্যোগগুলি গড়ে ওঠে। ভারি শিল্প যেমন, ইস্পাত, সড়ক পরিবহণ, সেতু ও সেচ বাঁধ ইত্যাদি পুঁজি নিবিড় কর্মকাণ্ডে দুর্বল দেশীয় পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগে অনীহা প্রকাশ করে। সামর্থ্যও ছিল না।

বিপুল পরিমাণে অর্থ বা পুঁজি বিনিয়োগ করে বছরের পর বছর ফেলে রাখলে মুনাফা হবে না। পুঁজির দ্রুত নবায়ন না হলে বিনিয়োগের লাভ কি? ১৯৫১ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি দেশের সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পদ সুচারুভাবে ব্যবহার করে দেশের ভবিষ্যৎ বিকাশ নিশ্চিত করার পথে অগ্রসর হন। ১৯৫৩ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতো অনন্য যোগ্যতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী পরিসংখ্যানবিদকে সামনে রেখে পরিকল্পনা কমিশন গড়ে তোলেন। কিছুটা সোভিয়েত মডেল কিছুটা ইঙ্গ-আমেরিকান মডেল অনুসরণ করে ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। এই বিকাশের ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচয়, স্বীকৃতি ইত্যাদি বিশেষভাবে ব্যবহার করে ভারতে বৈদেশিক প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিশ্চিতই একধরনের সমাজবাদের প্রতি প্রবল আবেগময় দুর্বলতা ছিল। কিন্তু তিনি বাস্তবে ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিই গড়ে তুলেছিলেন। সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এখন পণ্ডিত নেহরুর নামে বিযোগার করে!

সেই ব্যবস্থায় অবশ্য নিয়ন্ত্রণ ছিল। যেমন তেমন করে দেশের নানা প্রান্তে গজিয়ে ওঠা পুঁজিপতিরা চলতে পেত না। অনেক ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণও লক্ষ করা গেছে। যাই হোক্, সে সমস্ত কিছু বিশদে আলোচনা এমনকি, উল্লেখের তেমন অবকাশ এই লেখায় নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি দেশের সাধারণ মানুষের অর্থে গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা কিছুকাল আগেও ছিল ৩৬৫। এর মধ্যে ২৭৭টি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। বাকিগুলি নানা রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে চলত। এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল বিপুল। প্রায় ১৬.৪১ লক্ষ কোটি টাকা। সরকার এসব থেকে বিপুল অঙ্কের ডিভিডেন্ডও পাচ্ছিল। শুধুমাত্র ২০১৬-১৮ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলি ২৫.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন করেছে।

এসব সত্ত্বেও ১৯৯০ সালের কিছুকাল আগে থেকেই ভারতের বর্ধিত শক্তিসম্পন্ন বেসরকারি পুঁজি রাষ্ট্রের কোনরূপ খবরদারি মেনে চলতেই অস্বীকার করতে থাকে। তারা চায় অবাধ বিনিয়োগ ও মুনাফার সুযোগ। কোনো রকম অনুমতি বা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে স্বাধীন ব্যবস্থার প্রবর্তন দাবি করতে থাকে ভারতের পুঁজিপতিরা। প্রকৃতপক্ষে তাদের বল্গাহীন স্বাধীনতার সূচনা হয় ১৯৯১ সালে। বিশ্বপুঁজিবাদের গতিময়তার সঙ্গে ভারতের বড় বড় পুঁজিপতিদের অনায়াস মিলনে চলতে থাকে পুঁজির স্বাধীনচেতা উদ্‌যাপন। পরবর্তীকালে এদের জন্যই সরকারের কোপ পড়তে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উদ্যোগগুলির ওপর। প্রায় সবকটি সংস্থাকেই ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলা শুরু হয়ে যায় দ্রুত।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির জমানা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে আরো দ্রুত দুর্বল করে জলের দরে বিক্রি করে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯১ সালে ড. মনমোহন সিং-নরসিমহা রাও-চিদম্বরম (MNC) যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তা এখন পূর্ণতা পাবার লক্ষ্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে বর্তমান সরকার। এইসব কোম্পানিগুলিতে কর্মরত কর্মচারীদের ন্যূনতম স্বার্থ বিপন্ন করে মোদি সরকার এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগমন অবশ্য পিছনদিকে চলা। দেশের স্বার্থ চুলোয় যাক!

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজি ও প্রযুক্তি উন্নত রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের বিশাল বাজার উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে। পূর্বের সরকারগুলি এ প্রসঙ্গে দুর্বলভাবে ব্যাঙ্ক বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ ছেড়েছে। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বাজারের খেয়ালখুশির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেনি। তাদের সেই দুর্বলতার কারণেই তারা সরকারি ক্ষমতা থেকে নির্বাসিত। নরেন্দ্র মোদি কোনো ঝুঁকি নিতেই প্রস্তুত নন। তিনি অতি দ্রুততার সঙ্গে ব্যাঙ্ক বীমা ইত্যাদির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে বেসরকারিকরণের পথে চলেছেন। এখন অবশ্য সরাসরি বেসরকারিকরণ আর বলা হচ্ছে না। অতি চতুরভাবে বলা হচ্ছে 'মনোটাইজেশন'। বাংলা করলে বলা যায় মুদ্রাকরণ। কিছুকালের জন্য অর্থের বিনিময়ে সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি পুঁজির কাছে গচ্ছিত রাখা হবে। আপাতদৃষ্টিতে ভাবটা এমনই সমগ্র 'অমৃতকাল' এই অপরাধের মধ্যে। এক গভীর ষড়যন্ত্র।

এবারের সারা ভারত ধর্মঘটে ১২ দফা দাবি উত্থাপিত হয়েছে। সবকটিই একান্তভাবে ন্যায্য এবং মানবিক। যথাযথ স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই বিপুল অংশের কর্মচারীদের। তাঁরা গ্রামে শহরে আশাকর্মী বা মিড ডে মিলের কর্মী হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও দিনমজুরির ওপরেই নির্ভরশীল। মোদি সরকার এই সব কর্মচারীদের সঙ্গে ক্রমাগত তঞ্চকতা ও প্রবঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির এমন সব প্রকল্পগুলি এইসব মানুষের কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত চলতে পারে না। জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশকেই তীব্র শোষণের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্তমান সরকার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বোধের পরিচয় দিতে সম্মত নয়। ২৮-২৯ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। সেই সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রকের অগোচরে ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও সারাদেশে ক্রিয়াশীল শ্রমিক কর্মচারীদের ফেডারেশন ও ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার কোনো উদ্যোগই হয় নি। উপেক্ষা করা হয়েছে ন্যায্য এবং নৈতিক দাবিগুলি। ফলত, শ্রমিক সংগঠনগুলি বাধ্য হয়েই সরকারের ইতর গোয়ার্তুমির বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হয়। সারা ভারতের সংগ্রামী কৃষকরাও এই ধর্মঘটে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। গ্রামীণ ভারত বন্‌ধের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

বর্তমান সময়ের অতি ক্রুর এবং জনস্বার্থ ধ্বংসকারী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন সংগঠিত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। শ্রমজীবী মানুষরাই সংকটদীর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আক্রমণের লক্ষ্য। কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন। আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে প্রতিদিন। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দু'দিনের ধর্মঘট/হরতাল যথেষ্ট নয়। আগামীদিনে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য আরও সংহত করে ধারাবাহিক বা লাগাতার আন্দোলনের পথেই চলতে হবে। আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েই কোন রাজনৈতিক দল মানুষের বন্ধু আর কে শত্রু তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হবে। সমস্ত সচেতন সাংগঠনিক শক্তিকে হাতিয়ার করেই অত্যাচার ও বঞ্চনা নির্ভর এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

চীনের দুর্নীতিতন্ত্র

৩-এর পাতার পর

পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী আবেগকে আশ্রয় করেই দেশ ও সমাজকে অদ্যাবধি চালনা করে এসেছে। দেশহীন শ্রমজীবী শ্রেণির স্বাধীনতা, মানবতা ও গণতান্ত্রিক সমানাধিকার থেকে চীনের মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু, পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বর্তমান অন্ধকার দশায়, তাদের প্রতি তুলনায় চীনের এই সব ব্যাপারে লজ্জিত হবার, কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ আজ নেই। বৈষয়িক উন্নতিই চীন নিজের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত করেছে ও সেই লক্ষ্যের দিকেই ক্রমশ ত্বরান্বিত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কস মনে করতেন, পুঁজিবাদীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, কেননা রাষ্ট্রকে তারা মনে করে লুঠের মাল, জয়লাভের পরে তারা চুটিয়ে ভোগ করবে, একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে দেবে। সেই কারণেই দুর্নীতি পুঁজিবাদের সঙ্গে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। আজকের বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে, এমনকি ভারতের সঙ্গেও এ ব্যাপারে চীনের কোনো নীতিগত বিভেদ তেমন নেই। আবার, মার্কস শুধু দুর্নীতির জন্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাতিল করতে হবে, বা জনগণ এই একটি কারণেই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এমনটাও বলেন নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটবে মুনাফামুখী অসাম্য বর্ধনকারী মানবিক অধিকার হরণকারী ও যুদ্ধ সহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী চরিত্রের জন্য। সেই দিক থেকে চীন যে আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদের সবচাইতে ঘৃণ্য ও অবক্ষয়িত রূপ, এমনটা নয়। পুঁজিবাদী সংকটে দীর্ণ হয়ে ভেতর থেকে বিদীর্ণ হবার মতো অবস্থাও চীনে আসেনি। সেটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও জাপানের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। চীনের যে কোনো সমস্যাকে খুঁচিয়ে বিষাক্ত করে তোলাটাই তাদের এই মুহূর্তের কর্মসূচি। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও মূল্যবোধ থেকে সরে আসার কারণে—উগ্র জাতীয়তাবাদ ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করবার জন্য আদর্শনৈতিক অস্ত্র আজ চীনের ভান্ডারে নেই।

সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবার পরিবর্তে চীন তার কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে শিল্প ও পরিষেবা প্রধান অর্থনীতিতে বদলে যাবার জন্যে এক বিপুল পার্টি নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির পথ ধরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় দেশের আর্থিক অবস্থা বদলে ফেলেছে। যার ফলে চীনের দরিদ্রতম মানুষেরাও দারিদ্র দশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাস্তবে, একমাত্র সেটাই চীনের দলবদ্ধ দুর্নীতিতন্ত্র সহ সবরকম বিচ্যুতি সামলে দেশটাকে টিকে থাকার অক্সিজেন যোগান দিচ্ছে।

পুঁজিবাদের চরিত্র হলো সবকিছুকেই বিক্রয়যোগ্য পণ্য করে তোলা। আর যা কিছু বেচাকেনা করা যায় না, যেমন সত্যিকারের ভালবাসা, আনন্দ, আনুগত্য, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, স্বনির্ভরতা, ইচ্ছা, স্বতস্ফূর্ততা ইত্যাদি পুঁজিবাদে অবহেলিত হয়। এসবকিছুকে প্রতিস্থাপিত করা হয় প্রাণহীন যান্ত্রিক বিনোদনে, এবং ইগো বা আত্মম্ভরিতা দিয়ে। আর, সমাজতন্ত্র এই মানবিক দিকগুলিকে খুলে দিয়ে সমাজকে সৃষ্টিশীল আনন্দের পথ দেখায়—, যা অফুরন্ত ও যার কোনো সীমায় গিয়ে ঠেকবার সমস্যা নেই। পরিবার, আত্মীয়তা ও দারিদ্রমুক্ত গ্রামসমাজ বা লোকসমাজ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের উত্তম আধার হয়ে উঠতে সক্ষম। গ্রাম সমাজকে ভেঙ্গে ফেলে চীন সমাজতন্ত্রের এই ভিতটাকেই ধ্বসিয়ে দিয়েছে। আর, দুর্নীতিকে করে তুলেছে একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। চীনে সমাজতন্ত্র এ মুহূর্তে কোথাও চোখে না পরলেও, দুর্নীতির বিপরীত সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের সুনীতির গভীরে তা বাড়ছে।

সূত্র : China's Crony Capitalism : The Dynamics of Regime Decay, Minzin Pei, Harvard University Press (2017)

মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নেই

আফগানিস্তানে উগ্র ইসলামপন্থী তালিবান সরকার বারো বছরের উর্ধে সমস্ত মেয়েদের শিক্ষার অধিকার বন্ধ করলো। তালিবানী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলভি আজিজ আহমদ রায়ান ফতোয়া জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আফগানিস্তানে কোথাও, কোনো বিদ্যালয়ে আর ওই বয়সের বেশি মেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এই সপ্তাহের প্রথমদিকেও দেশের ধর্মান্ধ সরকার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরে যাবার জন্য আবেদন করেছিল। তারপরেই শিক্ষামন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে যে, সাংস্কৃতিক কারণেই মেয়েদের স্কুলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল। সমস্ত বিদ্যালয়েই ছাত্রীদের স্কুল গেট থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উগ্র ধর্মান্ধ উন্মাদরা মানব সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করতে দেশে দেশে উদগ্র আচরণ করে চলেছে। পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার স্বীকার করে না উগ্র ধর্মান্ধতাবাদ। নারী অধিকার অবদমন এক সাধারণ প্রবৃত্তি। নারীর স্থান একান্তভাবেই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। এমন অপরাধ করাই সভ্যতার শত্রুদের উদ্দেশ্য। নারী শুধুমাত্র গৃহকর্ম এবং সন্তান উৎপাদনের কাজই করবে। তাদের অন্য কোনো অধিকার দেওয়া যাবে না।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-